বিশেষ সংখ্যা ঃ হ্যালীর ধূমকেতু

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

জানুয়ারী ১৯৮৬

জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনাসমগ্র

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্রের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'অব্যক্ত'। পরবর্তী 'প্রবন্ধাবলী'। কেবলমাত্র 'অব্যক্ত' ও 'প্রবন্ধাবলী'র কিশোরপাঠ্য রচনাই নয়, জগদীশচন্দ্রের আরও অনেক গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র ও বক্তৃতাবলী বর্তমান সঙ্কলনে প্রকাশিত হল যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। বহু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র-সমৃদ্ধ গ্রন্থটির দাম ২৫ টাকা।

সঙ্কলন ও সম্পাদনা

দিবাকর সেন

আজকের দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হাতেকলমে কাজ করা (Work Education) তো শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকেই নিজের হাতে একটা কিছু তৈরী করতেই হবে।

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে এমন অনেক জিনিসই আমাদের ছেলেমেয়েরা তৈরী করতে আগ্রহী হলেও তেমন নির্দেশমূলক বই কোথায়? কিছুটা সেই অভাব মেটাবার জন্যই প্রকাশিত হল—'নিজে নিজে কর'। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কয়েকটি মডেলসহ অজস্র মডেলের সচিত্র নির্মাণপ্রণালী। দাম ১০·০০

জনপ্রিয় স্তরে বিজ্ঞানসংক্রান্ত বহু লেখা লিখেছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। বক্তৃতাও দিয়েছেন বাংলা ও ইংরাজীতে। তবে ছোটদের জন্য তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত শিশু-ভারতীতে।
প্রধানতঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তেরই অনুরোধে তিনি ছোটদের জন্য কলম ধরেছিলেন। পৃথিবীর আয়তন, অভিযান, আবিষ্কার ও গবেষণা-মূলক ডঃ সাহার সেই সব রচনা শুধু কিশোর নয়, আজকের দিনের বয়স্ক পাঠকেরও কৌতূহলের বিষয়। সেই সব রচনার সংগে যুক্ত হয়েছে মেঘনাদ সাহার অপ্রকাশিত পত্রা-বলী। দুর্লভ আলোকচিত্রসমৃদ্ধ গ্রন্থটির দাম ১২·০০।

মেঘনাদ সাহা
কিশোর রচনাসঙ্কলন

সম্পাদনা করেছেন

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও
এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

পঞ্চম বর্ষ 9ম সংখ্যা Jan. 1986

আগামী সংখ্যায়

'সাইক্লোট্রন' যন্ত্রের নাম আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু যন্ত্রটি দেখতে কেমন, কি করে এই যন্ত্র তৈরি হয় আমরা অনেকেই জানি না। আমরা জানি না এই যন্ত্র কেমন করে চালাতে হয় বা এই যন্ত্রের উপযোগিতা কি! আসলে কোন কণাকে দ্রুতগামী করার জন্যই এর ব্যবহারের প্রয়োজন। সল্ট লেকে ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের গবেষণাগারে সাইক্লোট্রন নির্মিত হয়েছে। এই যন্ত্রটির বিশেষ ব্যবহার ও নির্মাণ নিয়ে আগামী সংখ্যায় লিখবেন সুযেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র।

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 2 : দপ্তর থেকে : ধূমকেতু নিয়ে জল্পনা ॥ সমরজিৎ কর 3

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

হ্যালির বেচাল ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র 20 : ধূমকেতু ॥ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার : অনুবাদ : অমিত রায় 9 : হ্যালি, হ্যালি, হ্যালি ॥ ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য 17

পড়াশোনা

পদার্থ বিজ্ঞানের কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 6 : কোষ ॥ দিনোজ কুমার দে 57
বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতু সম্বন্ধে কতটা জান ? ॥ বিবেক রায় 59

ছবিতে গল্প

কার্টুন : রেবতীভূষণ ॥ 8, 24
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 45

রঙীন ফিচার

কম্পিউটারের চোখে হ্যালির ধূমকেতু 45 : স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ যান ॥ 27 : সর্বাধুনিক মহাকাশযান ভেগা ১ এবং ২ ॥ 26

ধূমকেতু বিষয়ক প্রবন্ধ

হ্যালির ধূমকেতু যুগে যুগে ॥ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 31 : খালি চোখে হ্যালির ধূমকেতু : বিমান বসু 38 : ধূমকেতু বার্তা : নেপথ্য কাহিনী ॥ রমাতোষ সরকার 53 : হ্যালি পর্যবেক্ষণ ॥ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 28
স্যার এড্‌মণ্ড হ্যালি ॥ অমরনাথ রায় 41

ছড়া

হ্যালির ধূমকেতু ॥ অন্নদা শঙ্কর রায় 37 : হ্যালির কমেট, হ্যালির কমেট ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 8 : আকাশে ঐ আলোর ঝাঁটা ॥ কৃষ্ণ ধর 37 : হ্যালি আসছে ॥ রঞ্জন ভাদুড়ী 43 : হ্যালির সন্ধানে ॥ রবীন সুর 43

পুনর্মুদ্রণ

প্রলয়ের ভয় ॥ সুকুমার রায় 5 : ধূমকেতু ॥ রাধা গোবিন্দ চন্দ্র 42

খেলা

অপারেশন হ্যালি : খেলার নিয়ম ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ 68

ছোটদের দপ্তর

আই কিউ টেস্ট ও কুইজ কনটেস্ট—উত্তরদাতাদের নাম 61 : ইলেকট্রনিক পাহারাদার ॥ শৌভিক চক্রবর্তী 62 : রকেট কুট ॥ গৌতম ঘোষ 63 : কুইজ কনটেস্ট 63 : আই কিউ টেস্ট 64
প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 65
ছবি এঁকেছেন : অলয় ঘোষাল

ভুল নয়

মনা সেন আগস্ট সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে লিখেছেন যে বিবেক রায়ের "পরমাণু ও গ্যাসের ধর্ম" আলোচনায় নাকি 10 নং প্রশ্নের উত্তর ভুল আছে। কিন্তু আসলে বিবেক রায়ের প্রশ্নানুযায়ী উত্তরটি সঠিক। মনা সেন নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করাতে চেয়ে তিনি নিজেই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছেন। আমার অনুরোধ আপনারা কোন একটা লেখাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ না করে আমাদের প্রিয় পত্রিকা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমালোচনায় ব্রতী হবেন না।

শান্তনু সাহা, গঙ্গারামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

প্রশ্নোত্তর

আমি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের একজন নিয়মিত পাঠক। আমার মতো নিশ্চয় আরো অনেকের কাছে এই পত্রিকাটি খুব প্রিয়। গত অক্টো-নভে 1985 সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর বিভাগে 11 নম্বর প্রশ্নের উত্তরে নাইট্রাস অক্সাইডের সংকেত NO_2 লেখা আছে। কিন্তু আমি আমার পাঠ্যবইতে পড়েছি, নাইট্রাস অক্সাইডের সংকেত N_2O. দুটির মধ্যে কোনটি ঠিক জানতে পারলে উপকৃত হব।

শমীক, রঘুনাথপুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

রক্তের তাপমাত্রা

এবারের আগস্ট '85 পত্রিকায় লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ প্রশ্নপত্রের মধ্যে 13 নং প্রশ্নের উত্তরটা মনে হয় ভুল হয়েছে। এ ব্যাপারটা একটু ভাল করে খতিয়ে দেখলে খুব কৃতজ্ঞ থাকব। প্রশ্নটা আছে আমাদের রক্তের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত? উত্তর অনুযায়ী বলা হয়েছে 110·6°F। কিন্তু ওটা মনে হয় 98·6°F হবে। কারণ এটাই আমাদের স্বাভাবিক তাপমাত্রা।

ডলি দাস, 69/A রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, কলিকাতা-85

অন্য গ্রহের মানুষ

সেপ্টেম্বর সংখ্যায় মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় "ডলফিনের দেশে" প্রবন্ধে অন্য গ্রহের মানুষ সম্বন্ধে বলেছেন যে, ক্রিপটাস থেকে সেখানকার মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে গবেষণা করতে। তিনি আরও বলেছেন যে, পৃথিবীর থেকে ক্রিপ্টাসের দূরত্ব একশো আলোক বর্ষ। তা হলে সেই মানুষগুলির আয়ুষ্কাল কত? আলোকের গতিবেগে আসলেও তো একশো বছর সময় লাগবে। কিন্তু আলোকের গতিবেগে আসা কি সম্ভব? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য! গল্প হলেও কল্পনা করা সম্ভব নয়।

গোলাম মোর্তজা (বাদল) রাখাল দাস পুর উচ্চ বিদ্যালয়, দশম শ্রেণী।

বস্তুর সরণ ও বল

আমি আপনাদের মাসিক পত্রিকা 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এর একজন নিয়মিত পাঠক। আগস্টের সংখ্যায় প্রকাশিত পদার্থ বিদ্যা প্রসঙ্গে লেখক একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন বলে আমার ধারণা। লেখক তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বুঝিয়েছেন যে কোনো বস্তুর সরণ 'শূন্য হলে তার কার্য শূন্য হয় না। অর্থাৎ, কার্যের হিসাব মোট সরণ থেকে পাওয়া যায় না।' কিন্তু আমি যতদূর জানি যে প্রযুক্ত বল ও বলের অভিমুখে বস্তুর সরণের গুণফল দ্বারাই মোট কার্যের পরিমাপ করা হয়। প্রশ্নানুযায়ী পাথরটিতে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তার সরণ 'শূন্য'। তাহলে মোট কার্য = প্রযুক্ত বল × 'শূন্য' = 'শূন্য'।

সমীর কুমার মাল, বাড়িখালী, হাওড়া।

মডেল নির্মাতাদের প্রতি

আমি একজন কিশোর-জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং গ্রাহক। আমার এই চিঠিটি কোন নির্দিষ্ট মডেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই আশাকরি চিঠি আপনাদের মনোনীত হবে। আমার মডেল সম্পর্কে প্রস্তাব হল যে আপনারা এমনভাবে মডেল নির্বাচন করে পত্রিকায় ছাপান যাতে মোটামুটি একই ধরনের যন্ত্রাংশ লাগে। যাতে একটি মডেল বানাবার পর যন্ত্রাংশগুলি খুলে নিয়ে আরো সামান্য কিছু যন্ত্রাংশ দিয়ে অন্য মডেল বানাতে ব্যবহার করা যায়। এতে যারা মডেল বানাবেন তাঁদের বারবার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ কিনে বেশী খরচা করতে হবে না। শুধু অর্থনৈতিক দিকই নয়, একটি যন্ত্র খুলে নিয়ে তার যন্ত্রাংশ অন্য যন্ত্রে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তাও আমরা জানতে পারব। আমার প্রস্তাবটি নিয়ে একটু দয়া করে ভাববেন। ধন্যবাদ নেবেন।

সিদ্ধার্থ সরকার, 210A/2, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-700 050।

জল আমাদের জীবন

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান অক্টোবর নভেম্বর '85 সংখ্যায় আবদুল হক খন্দকার লিখেছেন, আমরা মায়ের পেটে যখন থাকি···ইত্যাদি। ছোটদের কাগজে বিস্তৃত লেখা সম্ভব নয়, তবুও জানাই আমরা ভ্রূণ অবস্থায় ঐ মূত্র খাই না, মা যা খায় তারই সারবস্তু মায়ের শরীরের 'প্লাসেন্টা' ও 'আম্বেইলি কালকড' এর মধ্য দিয়ে ভ্রূণের শরীরে প্রবেশ করে এবং খাদ্যরস যোগায়। ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বিপাক প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য ঠিক নয়। ছোটদের কাগজে ভুল তথ্য পরিবেশন করা কি ঠিক?

বলরাম মজুমদার, বস্তুবিজ্ঞান মন্দির কলিকাতা-9।

ধূমকেতু নিয়ে জল্পনা

সমরজিৎ কর

দপ্তর থেকে

অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলো। ধরো, তোমার কোন এক বন্ধু। তাকে দেখে অমনি তুমি বলে উঠলে, "কি ব্যাপার, তুমি যে একেবারে ধূমকেতু হয়ে গেছ?" শুধু তুমি নয়, এ ধরনের সম্ভাষণ কিন্তু অনেকেই আমরা করি। অনেক দিন পর আগাম খবর না দিয়ে কেউ এলে আমরা অনেকেই তাকে বলি ধূমকেতু।

ধূমকেতু এক ধরনের জ্যোতিষ্ক। সাধারণভাবে বিশেষ ধরনের এই জ্যোতিষ্ককে দুই ভাগে ভাগ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ওপার যে অংশটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত মনে হয় তার নাম 'কোমা'। 'কোমা'র পেছনে থাকে দীর্ঘ মেঘের মত অংশ। পৃথিবী থেকে দেখায় কতকটা ঝাঁটার মত। এই অংশটিকে বলা হয় 'পুচ্ছ'। ধূমকেতুর নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো ধূমকেতুর 'কোমা' এবং পুচ্ছে গিয়ে পড়লে সৃষ্টি করে প্রতিপ্রভা। সেই প্রতিপ্রভাই 'কোমা'টিকে করে তোলে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। আর পুচ্ছটি দেখায়—একফালি দীর্ঘ মেঘ, ঝাঁটার মত। গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র খচিত আকাশের বুকে বিচিত্র এই বস্তুর আবির্ভাব শুধু বিজ্ঞানীই নয়, আবহমান কাল সাধারণ মানুষের মনেও কত রকম কৌতূহলই না সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর সব দেশেই। অথর্ববেদে ধূমকেতুর কথা বলা হয়েছে। চীনের প্রাচীন শাস্ত্রকাররাও দিয়েছেন ধূমকেতুর বিবরণ। বিভিন্ন সময়ে শিল্পীরা এঁকেছেন ধূমকেতুর ছবি। অজস্র নক্ষত্রের মাঝে হঠাৎ এক জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব। আকাশের অনেকটা অংশ জুড়ে উজ্জ্বল মেঘের মত পুচ্ছ। এমন দৃশ্য শিল্পীদের বিস্মিত করেছে। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ।

আকাশের কোথায় কখন কোন্ গ্রহ উপগ্রহ থাকে, অথবা নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুচ্ছ, প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও তা আগে থেকে জানতে পারতেন। কিন্তু আকাশের কোথাও কখন ধূমকেতু দেখা দিতে পারে এ সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণা ছিল না। গত দুশ' বছরে অবশ্য নিয়মিত বিভিন্ন ধূমকেতুর উপর পর্যবেক্ষণ চালান হয়েছে। তাতে দেখা গেছে কোন কোন ধূমকেতু নির্দিষ্ট সময় অন্তর আকাশে দেখা দেয়। যেমন হ্যালির ধূমকেতু। আবার অনেক ধূমকেতু একবার দেখা দিয়ে চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। জানা গেছে, যে-সব ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি আসে একমাত্র তাদেরই আমরা দেখতে পাই। আবার অনেক ধূমকেতু বৃহস্পতির কাছাকাছি এসে আবার ফিরে যায়। তাদের পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন হল, কোথায় থাকে ধূমকেতু? গ্রহ উপগ্রহ গ্রহাণুর মত ধূমকেতুও কি সৌরমণ্ডলেরই কোন বস্তু? জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে এ জল্পনার শেষ নেই। তাঁদের ধারণা, সৌরজগতের প্রান্তসীমার কাছাকাছি এক ধরনের মেঘ দেখা যায়। যার নাম 'উওরটের মেঘ'। এই মেঘময় অঞ্চলে বাস করে অজস্র ধূমকেতু। পুচ্ছবিহীন ব্যাঙাচির মত। বলা হচ্ছে, সূর্য একটি 'জোড় নক্ষত্র' (Double star)। অনেকেই তোমরা হয়ত জান, শতকরা ষাট ভাগ নক্ষত্রই 'জোড় নক্ষত্র'। এইসব নক্ষত্রের কেউই নিঃসঙ্গ নয়। তারা বিচরণ করছে জোড় বেঁধে—এক সঙ্গে দুটি নক্ষত্র নির্দিষ্ট অভিকর্ষ কেন্দ্র ঘিরে পরিক্রমা করছে যমজের মত। আমাদের সূর্যেরও রয়েছে একটি সঙ্গী। সেই সঙ্গী নক্ষত্র যখন সূর্যের কাছাকাছি হয়, তখন তার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উওরটের মেঘ থেকে কোন কোন ধূমকেতু সৌরজগতের মধ্যে চলে আসে। চলে এসে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে সূর্যের দিকে অগ্রসর হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ বৃহস্পতির কাছাকাছি এসে আবার উওরটের মেঘে ফিরে যায়। কেউ কেউ চলে আসে সূর্যের কাছাকাছি। 1908 সালে সাইবেরিয়ার টুংনুসকার বনাঞ্চলে এসে আঘাত করেছিল বিরাট এক অগ্নিগোলক। এর ফলে ওই বনাঞ্চলের কিছু অংশ ধ্বংস হয়। অনেকের ধারণা ওই অগ্নিকুণ্ড একটি ধূমকেতুর 'কোমা'। অবশ্য এ নিয়ে অনেক বিতর্কও রয়েছে।

দপ্তর থেকে

এতো গেল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা। কিন্তু সাধারণ মানুষ? হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের কাছে ধূমকেতু চিরদিনই যেন অপার বিস্ময়। পৃথিবীর সব দেশেই ধূমকেতু নিয়ে রচিত কত রকম গল্প। কতই না জল্পনা। অনেকে মনে করেন আকাশে ধূমকেতুর আগমন মানে মানুষের দুঃখ। ধূমকেতু দুঃখের প্রতীক। ধূমকেতু দেখা দিলে শুরু হয় বন্যা, মড়ক অথবা খরা। নদীর জল শুকিয়ে যায়। পঙ্গপালের ঝাঁক এসে গ্রাস করে মাঠের ফসল। ধূমকেতু নিয়ে আসে মারমুখী রোগ। ঘটায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ—ঝড়, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ইত্যাদি। নিয়ে আসে দুর্ভাগ্য। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, এই সব ঘটনার সঙ্গে ধূমকেতুর সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে—এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পান নি। ধূমকেতুর সঙ্গে এ সব ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতির দরুন ধূমকেতুর ব্যাপারে এমন অনেক কিছুই জানতে পেরেছি আমরা। জানা গেছে, ধূমকেতুর প্রধান যে অংশ, যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন 'কোমা', 'হেড' অথবা নিউক্লিয়াস—সেটি জমাট একটি বস্তুপিণ্ড। সূর্যের যত কাছে এগিয়ে আসতে থাকে, তার উত্তাপে 'কোমা'র বস্তু বাষ্পীভূত হতে থাকে। সেই বাষ্পীয় মেঘ সৃষ্টি করে পুচ্ছ। সূর্যের যত কাছে আসে, পুচ্ছটি ততই বাড়তে থাকে। বাষ্প সূর্যের আলো শোষণ করে। সৃষ্টি করে প্রতিপ্রভা। 'কোমা'ও প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। 'কোমা' এবং মেঘ প্রতিফলিত করে সূর্যের আলোও। সেই বিকীর্ণ আলো এবং প্রতিপ্রভা বিশ্লেষণ করে ধূমকেতু সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর তথ্যও জানা গেছে।

জানা গেছে, ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্যে থাকে নানা রকম আয়ন CO^-, CO_2^-, N_2^+, OH^+, CH^+ প্রভৃতি। জানা গেছে সৌরশক্তির ধাক্কায় পুচ্ছের আয়নগুলি প্রচণ্ডগতিতে ধূমকেতুর গতির বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। এই ধাক্কার পরিমাণ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রায় 1000 গুণ। ধূমকেতুর 'কোমা' পাথর এবং বরফে তৈরি। বরফ জল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে তৈরি। অনেকের ধারণা, ধূমকেতুর 'কোমা'র মধ্যে এমন বস্তুও রয়েছে যা সৃষ্ট হয়েছিল সৌরজগত সৃষ্টির সময়। সৃষ্টির পর থেকে তাদের কোন পরিবর্তন হয় নি। এইসব বস্তুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে হয়ত অনেক আজানা তথ্য জানতে পারবেন বিজ্ঞানীরা। আগে ধূমকেতুর উপর পর্যবেক্ষণ চালান হত পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে। এখন এ কাজটি করার জন্যে সাহায্য নেওয়া হয়েছে মহাকাশযানের। হ্যালির ধূমকেতুর দিকে পাঠান হয়েছে একাধিক মহাকাশযান। পাঠিয়েছে সোভিয়েত দেশ, জাপান, এবং ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা। এসব যানে রয়েছে কম্পিউটার, বিশেষ ধরনের বীক্ষণযন্ত্র। এইসব যান ধূমকেতুর কাছাকাছি গিয়ে এবং পুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করে সংগ্রহ করবে নানারকম তথ্য। যা এর আগে হয়ত আর কখনো জানা যায় নি। আমরা আশা করছি এসব তথ্য সময়মত তোমাদের জানাতে পারব। বর্তমান সংখ্যায় ধূমকেতুর বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হল। এইসব প্রবন্ধে ধূমকেতুর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব আলোচনা থেকে ধূমকেতু সম্পর্কে অনেক তথ্য তোমরা জানতে পারবে। কেমন লাগে, জানাবে। আরো কিছু জানার থাকলে চিঠি লিখতে ভুলো না, কেমন? আপাতত এখানেই শেষ করছি।

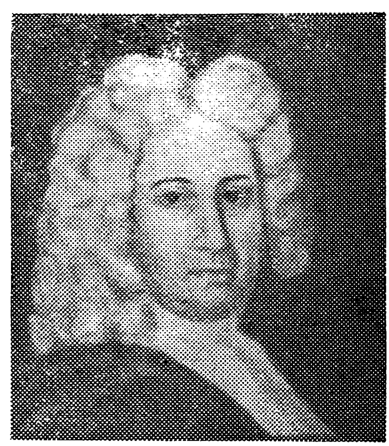

স্যার এডমণ্ড হ্যালি

ভ্রম সংশোধন: শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান 1392তে প্রকাশিত রতনলাল ব্রহ্মচারীর 'রহস্যময় অক্টোপাস' প্রবন্ধের চিত্র পরিচিতি নিম্নরূপ হবে।

1 নং চিত্র: দীঘার অক্টোপাস   2 নং চিত্র: দীঘার স্কুইড   ফটো: ভূমধ্য সাগরের স্কুইডের ভ্রূণ।

প্রলয়ের ভয়

সুকুমার রায়

পৃথিবীর ইতিহাসে কতো বড় বড় দুর্ঘটনাকে যে মানুষ ধূমকেতুর ঘাড়ে চাপিয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না! নানা দেশের ইতিহাসে নানা সময়কার ধূমকেতুর যেরকম অদ্ভুত ভয়ংকর সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায় যে লোকে তাদের কিরকম ভয়ের চোখে দেখেছে। আমরা ছেলেবেলায় একবার খবরের কাগজে গুজব শুনেছিলাম যে কোথাকার এক 'পাগল ধূমকেতু' নাকি পৃথিবীর দিকে আসছে—আর কোনো জ্যোতিষী নাকি গুণে বলেছেন যে সে অমুক তারিখে এই পৃথিবীকে এমন চুঁ লাগাবে যে তখন কেউ বাঁচে কিনা সন্দেহ! এই খবরটা নিয়ে তখন চারিদিকে খুব একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কয়েক বৎসর আগে যখন 'হ্যালির ধূমকেতু' এসে দেখা দেয় তখন কেউ কেউ গুণে দেখিয়েছিলেন যে ঐ ধূমকেতুর ঝাঁটার মতো লেজটা পৃথিবীর উপর এসে পড়বে। ঐ লেজের বাড়ি খেলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি হবে তাই নিয়ে কাগজপত্রে খানিকটা তর্কাতর্কি'ও হয়েছিল, কিন্তু সময় হলে দেখা গেল যে তাতে পৃথিবীর তো কিছু হলই না, বরং লেজটাই ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে গেল। সুতরাং ধূমকেতুর ধাক্কা লেগে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কল্পনাটা কোনো কাজের কল্পনা নয়, কারণ ধূমকেতুর লেজটা এমনই অসম্ভব রকম হালকা যে পৃথিবীর সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করতে গেলে তারই বিপদ হবার কথা! তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীকে যদি কোনোদিন কোনো ধূমকেতুর মাথাটার ভিতর দিয়ে যেতে হয় তা হলে অবস্থাটা কেমন হয়, ঠিক বলা যায় না। সম্ভবত তখন খুব একটা জমকাল গোছের উল্কাবৃষ্টি হবে।

উল্কাবৃষ্টি জিনিসটা আমি কখনো চোখে দেখি নি, কিন্তু তার যে বর্ণনা শুনেছি সে ভারি চমৎকার! আকাশে মাঝে মাঝে তারার মতো এক-একটা কি যেন হঠাৎ ছুটে দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়—দেখে লোকে বলে 'তারা খসল'। কিন্তু আসলে সে তারা নয়—উল্কা। ঐরকম উল্কা যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা না খসে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে আকাশের উপর দিয়ে ছুটে যায়—তখন তাকে বলে 'উল্কাবৃষ্টি'। এর মতো জমকাল ব্যাপার অতি অল্পই আছে। আমরা আকাশে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র দেখি তারা সবাই ভালো মানুষের মতো স্থির হয়ে থাকে, তারা ওরকম পাগলের মতো ছুটোছুটি করে না। সুতরাং হাজার হাজার উল্কাকে অমনভাবে ছুটোছুটি করতে দেখলে হঠাৎ মনে কেমন ভয় হয়—যদি দু-চারটা ঘাড়ে এসে পড়ে, তা হলে অবস্থাটা কিরকম হবে। কিন্তু আসলে তেমন ভয় পাবার কিছুই নেই। উল্কাগুলির প্রায় সমস্তই পৃথিবীতে পড়বার ঢের আগেই বাতাসের ঘষায় আপনা হতেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদি না জ্বলত তবে আমরা তাদের দেখতেই পেতাম না; কারণ, একে তারা অধিকাংশই নিতান্ত ছোটো, তার উপর তাদের নিজেদের কোনো আলো নেই; কেবল মরবার সময় যখন তারা আপন "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে" জ্বলে মরে তখন তার সেই শেষ আলোতে আমরা তাদের একটুক্ষণ দেখি মাত্র। যা হোক, ভয়ের কারণ নাই-বা থাকুক একেবারে হাজার হাজার উল্কা পৃথিবীর উপর ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরছে একথা ভাবতেও খুব আশ্চর্য লাগে। ব্যাপারটা চোখে দেখতে আরো আশ্চর্য, তাতে আর সন্দেহ কি?

আর একটি ভয়ানক জমকাল ব্যাপারের কথা না বললে একটা মস্ত কথা বাদ থেকে যায়—সেটি হচ্ছে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। এ জিনিসটি যিনি একবার চোখে দেখেছেন তিনি আর কখনো ভুলতে পারেন না। যখন গ্রহণটা পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে. চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, চাঁদের প্রকাণ্ড কালো ছায়া দেখতে দেখতে চোখের সামনে পাহাড় নদী সব গ্রাস করে ছুটে আসতে থাকে—যখন বনের পশু আর আকাশের পাখি পর্যন্ত ভয়ে কেউ স্তব্ধ হয়ে থাকে, কেউ চীৎকার করে আর্তনাদ করে তখন মানুষের মনটাও যে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বিশেষত যারা অশিক্ষিত বা অসভ্য, যাদের কাছে সূর্যের এই হঠাৎ নিভে যাওয়ার কোনোই অর্থ নেই, তারা যে তখন পাগলের মতো অস্থির হয়ে বেড়াবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক। তারাও প্রলয় বলতে ঠিক এইরকমই একটা কিছু কল্পনা করে - এমনই একটা অদ্ভুত বিরাট গম্ভীর ব্যাপার—যার ভয়ংকর মূর্তিতে মানুষের মনকে একেবারে দমিয়ে অবশ করে দেয়।

সন্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২৪

পড়াশোনা

পদার্থ বিজ্ঞানের কথা

অজয় চক্রবর্তী

বস্তুজগতের মূল উপাদান দু'টি। একটি হলো পদার্থ, অন্যটি শক্তি। শক্তি এবং পদার্থের মৌলিক ধর্ম এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়াই পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচ্য। কাজেই, পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে প্রথমে পদার্থ এবং শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। আমরা পদার্থের একটি মৌলিক ধর্ম নিয়ে কথারম্ভ করছি।

পদার্থ অবিনশ্বর। এর ধ্বংস নেই, সৃষ্টিও নেই। বস্তুজগতে প্রতিনিয়ত নানান পরিবর্তন ঘটছে। এ মুহূর্তে যা তরল পরমুহূর্তে তা গ্যাসীয় অবস্থায় চলে গিয়ে দৃষ্টির অগোচরে চলে যাচ্ছে। যে-জল সমুদ্রের বুকে ঢেউ-এর তালে তালে দুলছে, সেই জলই আবার বাষ্পের আকারে অন্তরীক্ষে স্থান করে নিচ্ছে ; কখনো বা মেঘরূপে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে, কখনো শুভ্র তুষার হয়ে যক্ষের মতো আগলে রাখে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা আছে কোন নাদির শা-ই তা লুণ্ঠন করতে পারে না।

আপাতদৃষ্টিতে যা হারিয়ে যায় প্রকৃত অর্থে তা হারায় না। লোডশেডিং-এর যুগে এ প্রসঙ্গে যে দৃষ্টান্ত প্রথমে মনে আসে তা হলো মোমবাতির দহন। মোমবাতি জ্বলতে জ্বলতে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়—এ আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। মোমবাতির এই বিলুপ্তিতে গৃহস্থের আপশোসের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির এতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। মোমবাতির এই বিলীন হয়ে যাওয়া বস্তুজগতের এক পরিবর্তন মাত্র। এ পরিবর্তন কেবল রূপান্তর, লোকান্তর নয়। দহনের ফলে মোম বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুতে মিশে যায়, কিন্তু সবটুকু পদার্থই অটুট থেকে যায়।

পাঠ্য পুস্তকের ভাষা এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। তাই বিজ্ঞানের কেতাবি ভাষা বর্জন করে আটপৌরে ভাষায় পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথাগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখবেন বলেছেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ অজয় চক্রবর্তী। আমাদের আশা, এ নিবন্ধ যারা পড়বে পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের ভীতি কেটে যাবে।

নেমে আসছে পর্বতশীর্ষে। বিশ্বজগৎ পরিবর্তনশীল। এখানে অনুক্ষণ চলছে নানান ভাঙ্গাগড়া, চলছে নানান রূপান্তর। কিন্তু এই রূপান্তরের সময় বিশ্বের মোট উপাদানের কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। প্রকৃতির রাজ্যে অপচয়ের কোন স্থান নেই। প্রকৃতি যদি কোথাও এক কড়ি খরচ করে তবে সে তার পুরো দাম উসুল করে তবে ছাড়ে। কোন চতুর প্রবঞ্চকই প্রকৃতিকে এক কানাকড়ি ঠকাতে পারে না। আমরা যখন কয়লা পুড়িয়ে রান্না করি তখন সবটুকু তাপ আমরা ব্যবহার করতে পারি না। যে ছাই-টুকু পড়ে থাকে তাও আমাদের কাজে আসে না। অর্থাৎ, আমাদের কপালে টাকায় ষোল আনা লাভ কখনোই হয় না। কিন্তু প্রকৃতির জমা-খরচের হিসেবে কোন গড়-মিল নেই। এখানে ডেবিট্-ক্রেডিট্ সমান না হয়ে উপায় নেই। উনুন থেকে বেরিয়ে যে-তাপ ভাতের হাঁড়িতে ঢুকতে গড়রাজি হলো সে-তাপ আমাদের ফাঁকি দিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে পারে না। প্রকৃতির অসংখ্য প্রহরীর হাতে সে তাপটুকুও ধরা পড়ে যায়। প্রকৃতি তার সমস্ত বস্তুনিচয়

মোমবাতির দহন দেখে যেমন মনে হয় পদার্থের বিলোপ ঘটছে, তেমনি এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যা থেকে মনে হতে পারে যে নতুন পদার্থের আবির্ভাব ঘটছে। চকচকে এক টুকরো লোহার ওপর যখন মরচে পড়ে তখন ঐ লোহার টুকরোর ভর বেড়ে যায়। কিন্তু এই বাড়তি ভর নতুন পদার্থের সৃষ্টি বোঝায় না। এই স্থানে ভর বাড়লে অন্যত্র ঠিক সে পরিমাণ ভরই কমে যায়—যাতে পদার্থের মোট ভরের কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে না পারে। মরচে-পড়া লোহার ভর বাড়ার কারণ হলো অক্সিজেনের সঙ্গে লোহার রাসায়নিক সংযোগ। মরচে-পড়া লোহার বাড়তি ভরটা হলো ঐ অক্সিজেনের ভর।

দহনে জ্বালানির ভরের হ্রাস ঘটে, কখনো বা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়—এটাই আমরা সাধারণত দেখি। কিন্তু কোন পদার্থকে জ্বালিয়ে দিলে দহনজাত ভস্মের ওজন কি ঐ পদার্থের ওজনের চেয়ে কখনো বেশি হতে পারে? তোমরা হয়তো ভাবছো, তা কী করে সম্ভবপর? কোন জ্বালানি জ্বলে গেলে যে ভস্ম বা ছাইটুকু পড়ে থাকে তা

তো জ্বালানির অংশমাত্র। কাজেই ভস্মের ভর জ্বালানির প্রারম্ভিক ভরের চেয়ে বেশি হবে কেমন করে? বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো অবাস্তব মনে হলেও এমন ঘটনা কিন্তু প্রকৃতিতে ঘটতে দেখা যায়। দীপাবলী উৎসবে তো তোমরা ম্যাগনেসিয়ামের ফিতে জ্বালিয়েছ। জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম থেকে ঠিকরে আসা উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে তোমাদের মনে এমন সন্দেহ কি কখনো হয়েছে যে, ম্যাগনেসিয়াম যতো জ্বলছে ততো ভারী হচ্ছে? আসলে কিন্তু সেটাই ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকলেও এ ঘটনা কিন্তু আদৌ অস্বাভাবিক নয়। এর কারণটা বুঝলে কিন্তু আর এ ঘটনাকে ব্যতিক্রান্ত বলে মনে হবে না। তখন বরং মনে হবে পুড়তে পুড়তে ম্যাগনেসিয়ামের ওজন না বাড়লেই সেটা হতো অস্বাভাবিক —হতো প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। আসলে, ম্যাগনেসিয়াম যখন জ্বলে তখন ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং ম্যাগনেসিয়াম-ভস্ম হিসেবে আমরা যা পাই তা হলো ম্যাগনেসিয়াম এবং অক্সিজেনের যৌগ—ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। অর্থাৎ, ম্যাগনেসিয়ামের দহনজাত ভস্মে ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেনও বিদ্যমান থাকে। ফলে এই ভস্মের ভর ম্যাগনেসিয়ামের ভরের চেয়ে বেশি হয়।

* * *

পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতাকে সূত্রাকারে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন, তাই পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায়েই নানান সূত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। পাকা রহস্য-সন্ধানী কিরীটি রায় কিংবা ব্যোমকেশ অকুস্থানের চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান চালিয়ে নানান সূত্র পেয়ে যান। আর সে-সব সূত্র ধরেই রহস্যের কিনারা করতে সক্ষম হন। বিজ্ঞানীরাও তেমনি প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটনে সূত্রের সন্ধান করেন। পদার্থবিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন সংরক্ষণ সূত্র বা নিত্যতা সূত্র। বিশ্বের কোন্ কোন্ রাশি অবিনশ্বর বা নিত্য—পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তা খুঁজে বের করতে সদা-সচেষ্ট। পদার্থ-বিজ্ঞানে তাই বেশ কিছু নিত্যতা সূত্র বা সংরক্ষণ সূত্রের বিবৃতি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একটি হলো ভরের নিত্যতা সূত্র। মোমবাতির দহন কিংবা ম্যাগনেসিয়ামের দহন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম তা হলো এই যে, বিশ্বের মোট ভরের পরিমাণ ধ্রুব। পদার্থের রূপান্তর ঘটে সত্য, কিন্তু পদার্থের ধ্বংস নেই, নতুন পদার্থের সৃষ্টিও সম্ভবপর নয়। পদার্থবিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্তটিই ভরের নিত্যতা সূত্র।

শক্তি সম্পর্কেও অনুরূপ একটি সূত্র আছে। সেটি হলো শক্তির নিত্যতা সূত্র। এ সূত্র অনুসারে শক্তির ধ্বংস নেই। এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু শক্তির অবলুপ্তি বা উদ্ভব নেই। অর্থাৎ, বিশ্বের মোট পদার্থের পরিমাণই যে ধ্রুব তা নয়, মোট শক্তির পরিমাণও ধ্রুব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, পদার্থ এবং শক্তি পরস্পরের তুল্য। পদার্থ থেকে শক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে, শক্তি থেকেও পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে। এ মতবাদ অনুসারে, পদার্থ এবং শক্তি একই বাস্তবতার দুটি ভিন্ন রূপ মাত্র। ভর এবং শক্তির তুল্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বোঝা গেল, ভর এবং শক্তি পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষিত থাকে না, তবে ভর এবং শক্তির মোট পরিমাণ সংরক্ষিত থাকে। কাজেই, বর্তমানে ভরের নিত্যতা সূত্র এবং শক্তির নিত্যতা সূত্র একত্রিত হয়ে ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্রের রূপ নিয়েছে। এ সূত্রানুসারে, বিশ্বের ভর এবং শক্তির মোট পরিমাণ ধ্রুব।

বাহ্য জগতের নানান ঘটনার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা খুঁজে বের করাই পদার্থবিজ্ঞানের কাজ। লোহা জলে ডোবে,—সেটাও নিয়ম, কর্কের ছিপি জলে ভাসে সেটাও নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে, যে নিয়মানুসারে লোহা ডোবে, সে নিয়মেই কর্ক ভাসে। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির বড়াই করে আমরা অনেক সময় বলি, মানুষ তার বুদ্ধিবলে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, প্রকৃতিকে দিয়ে মানুষ তার ইচ্ছে মতো কাজ করিয়ে নিচ্ছে। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বলতে যদি বোঝায় প্রকৃতির অনিচ্ছায় তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া তাহলে বলতেই হয় তা মানুষের পক্ষে কোনদিনই সম্ভবপর হবে না, হতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম খুঁজে বের করে সে-নিয়ম অনুসরণ করেই মানুষকে নিজের কাজ হাসিল করার নানান পন্থা উদ্ভাবন করে নিতে হয়। আকাশে উড়োজাহাজ ওড়ে প্রকৃতিরই নিয়মানুসারে, পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে অফুরান শক্তি বেরিয়ে আসে প্রকৃতিরই নিয়মে। বিজ্ঞানের কোন উদ্ভাবনই প্রকৃতিকে আপন বশে আনতে পারে না, সর্বক্ষেত্রেই মানুষের উদ্ভাবিত যন্ত্রকৌশল প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত। বিশ্বপ্রকৃতির আইন-কানুন বড়ো কড়া। এখানে নিয়মভঙ্গের সাধ্য কারো নেই। দৃষ্টির স্বচ্ছতার অভাবে যে-ঘটনাকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলে মনে হয় তাও নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন মানুষের নিয়ম-কানুনের মতো ঢিলেঢালা নয়। এখানে মন্ত্রিসভায় বিল পাশ করে যখন-তখন নতুন নিয়ম চালু করা হয় না। তা যদি হতো তবে বিজ্ঞানীদের কাজকর্ম এবং গবেষণা অর্থ-হীন পণ্ডশ্রম হতো; কেননা, আজকের বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণায় প্রকৃতির যে-নিয়ম আবিষ্কার করলো তা যদি আগামীকালও প্রযোজ্য না হয় তবে তো সমস্ত বিজ্ঞান-

প্রয়াসই ব্যর্থ হতো। মানব-সমাজে আইন-ব্যবসায়ীরা তাঁদের মক্কেলদের সেবায় আইনের ফাঁক খোঁজেন এবং বহুক্ষেত্রে তেমন ফাঁক-ফোঁকড় তারা পেয়েও যান। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যের আইনে সূচাগ্র পরিমাণ ফাঁকও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর, আইনের ফাঁক নেই বলে আইনের পরিবর্তনের অবকাশও নেই। অনন্ত অতীত থেকেই প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য এবং চিরন্তন।

প্রকৃতির নিয়মাবলীর নিত্যতাকেও একটি সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায়। এই সূত্রটির নাম হলো 'সময়ের সমরূপতার সূত্র' (principle of honogenerty of time)। এ সূত্রানুসারে, আজ যে-কারণে যে-ঘটনা ঘটছে, আগামীকালও সে-কারণে তাই ঘটবে, অতীতেও সে-কারণে তাই ঘটতো। সময়-প্রবাহ সমসত্ব। সময়ের কোন বিশেষ মুহূর্তের প্রতি প্রকৃতির কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। যদি তা থাকতো তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি আদৌ সম্ভবপর হতো না। মানুষ পদে পদে বিপদগ্রস্ত হতো। অতীতের কোন অভিজ্ঞতাকেই আমরা তখন কাজে লাগাতে পারতাম না। আমাদের উত্তর পুরুষদের জন্য আমরাও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বা তত্ত্ব রেখে যেতে পারতাম না। আমাদের সৌভাগ্য প্রকৃতিতে মন খামখেয়ালি নয়।

উল্লেখ করা হয়েছে, পদার্থ এবং শক্তির ধর্মাবলী এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াই পদার্থবিজ্ঞানের আলোচ্য। ক্রমশঃ আমরা পদার্থের সাধারণ ধর্মগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করবো।

হ্যালির কমেট হ্যালির কমেট

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হ্যালির কমেট, হ্যালির কমেট এত দিনের পরে
পৃথিবীখানা দেখছো কেমন, বলো না সত্যি করে।
সেই যে তুমি এসেছিলে অনেক বছর আগে
তখন বাতাস মিষ্টি ছিল এখন কেমন লাগে ?
তখন ছিল সবুজ ধরা এখন কেমন ধারা?
অন্য কোথায় আছে এমন ? আমরা সৃষ্টিছাড়া ?
দেখছো কত নতুন কিছু লম্বা লম্বা বাড়ি

বিজলি রেলের পাশ দিয়ে যায় রিক্সা, গোরুর গাড়ি
আকাশ জুড়ে বিমান রকেট করছে হাঁকাহাঁকি
অ্যাটম বোমার ধোঁয়ায় তোমার চোখ জ্বলছে নাকি ?
সাহেব কমেট, সাহেব কমেট, একটা কথা বলো
এখন সবাই খারাপ এবং আগের সবাই ভালো ?
এই কথাটা মানতে আমি কিছুতেই পারবো না
কালোর মধ্যে আলোও থাকে, ছাইয়ের মধ্যে সোনা।

কার্টুন/রেবতীভূষণ

জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর গুরু বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের মতোই জয়ন্ত নারলিকার বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখতে ভালবাসেন। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় তাঁর লেখা গল্প এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। 'ধূমকেতু' গল্পটি তাঁর একটি সাম্প্রতিকতম উল্লেখযোগ্য গল্প, —এবং হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব উপলক্ষে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

—সম্পাদক

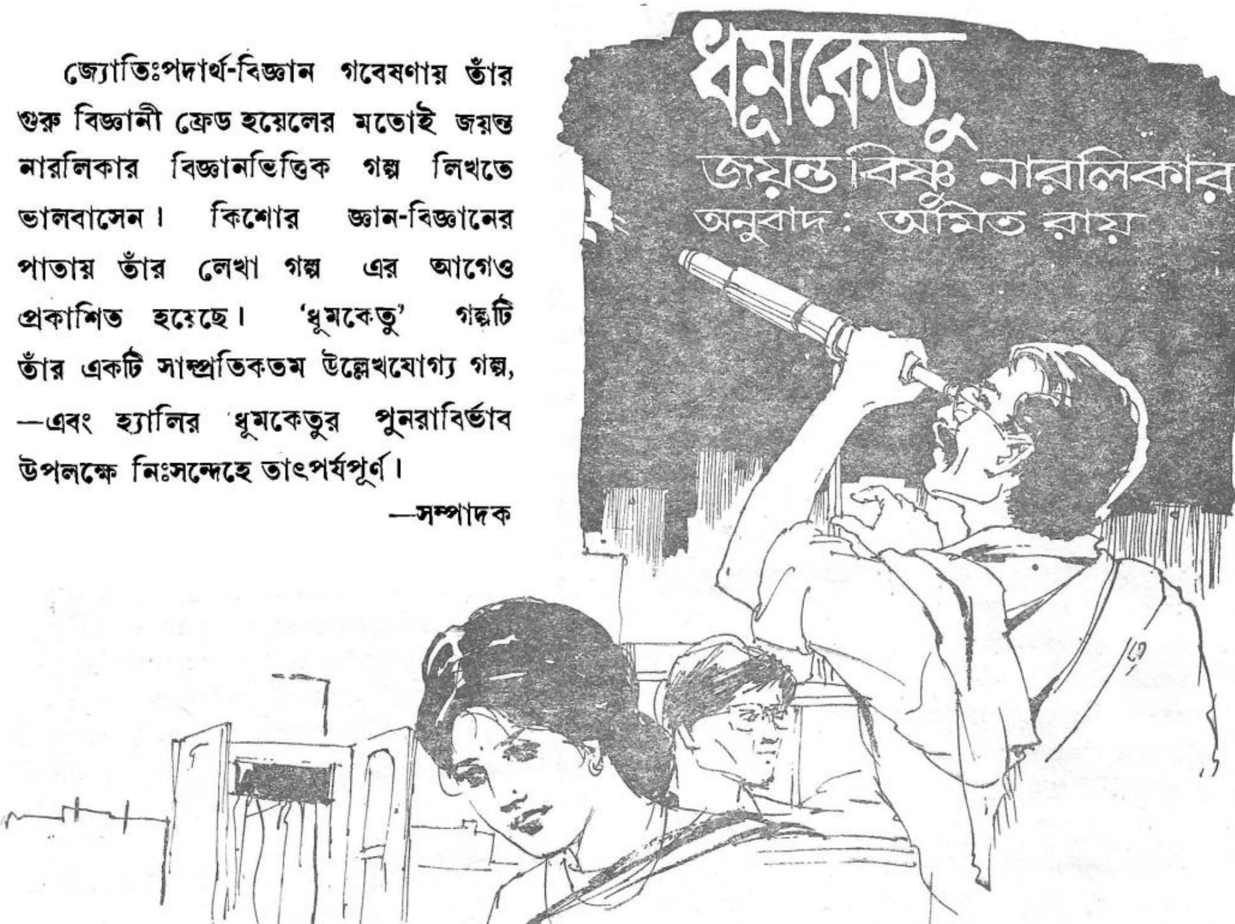

ডিসেম্বরের কলকাতা, আকাশে চাঁদের দেখা নেই, জানলা দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়াতে ঘুম ভেঙে গেল ইন্দ্রাণী দেবীর। আধো জাগা অবস্থায় তিনি পাশের বালিশে হাত রাখলেন। যা অনুমান করেছিলেন ঠিক তাই। যথারীতি দত্তদা বিছানায় শুয়ে নেই।

ইন্দ্রাণী দেবী তবু দরজার দিকে তাকালেন। দরজাটা ঈষৎ খোলা রয়েছে। "দিব্যর সঙ্গে তা'লে এখন দোস্তি চলছে। কিন্তু যাবার আগে দরজাটা তো বাপু বন্ধ করে যেতে পারতো—" মনে মনে অভিযোগ করলেও মুখে একটু হাসি ফুটে ঠলো ইন্দ্রাণী দেবীর। তিনি ভালো করেই জানেন তাঁর স্বামী জীবনধারণের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে কতটা উদাসীন। ডাক্তার বলেছেন ঠাণ্ডা না লাগাতে। কিন্তু শোনে কে? এমন আপনভোলা লোক যে বিছানার পাশের চেয়ারে সোয়েটারটা পড়ে আছে তাও পরতে ভুলে গেছে। অবশ্য পরবেই বা কি করে—বিশেষ করে দিব্য যখন তার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে।

ইন্দ্রাণী দেবী একটা সাদা উলের পুলোভার নিয়ে শালটা গায়ে জড়িয়ে ছাদে এলেন। যা আন্দাজ করেছিলেন ঠিক তাই। দেখলেন দত্তদা দিব্যর চোখে চোখ রেখে আত্মমগ্ন।

ইঞ্চির হিসাবে দিব্যর শরীরের পরিমাপ হচ্ছে ৪ ৬ ১ । এ্যাপারচার আট ইঞ্চি, ফোকাল লেনথ 64 ইঞ্চি।

দত্তদা যখন এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির মালিক হলেন তখন এত খুশী হয়েছিলেন যে আদর করে তার নাম রাখলেন—দিব্য চক্ষু, মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্যে মানুষের চোখের চেয়ে জিনিসটা কত ভাল। ইন্দ্রাণী দেবী ভাবেন এ এক মহা জ্বালা হয়েছে। দত্তদা তো সব ভুলে কেবল দিব্যকে নিয়েই মেতে রয়েছেন। তিনি অবশ্য দত্তদার দেওয়া 'দিব্যচক্ষু' নামটাকে

একটু ছোট করে বলেন 'দিব্য'। আর ওই নামটাই চলে আসছে।

দত্তদার মনে পড়লো 1986তে হ্যালির ধূমকেতুর ফিরে আসা সম্পর্কে লোকের মনে কি দারুণ উত্তেজনার সঞ্চার করেছে। এই ধূমকেতু প্রতি 76 বছর পর পর সূর্যের কাছে চলে আসে। দত্তদা জানেন যে দীর্ঘ সময় ধরে কক্ষপথ পরিক্রমা করে এমন ধূমকেতু রয়েছে। আর অতীত কোন ইতিহাস নেই এমন কোন ধূমকেতুকেই নতুন বলে গণ্য করা হয়। আর তার নামকরণ করা হয় তার আবিষ্কারকের নামেই। এর থেকেই দত্তদার মনের সুপ্ত বাসনা যে একদিন না একদিন তিনি "কমেট দত্ত" আবিষ্কার করবেনই।

কিন্তু মাত্র 8 ইঞ্চির একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে তার সে আশা কি পূর্ণ হবে কোনদিন? দত্তদা মনে মনে ভাবেন যে পেশাদারী জ্যোতির্বিদদের তো বিরাট বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে। সেগুলোতে আবার নানান আধুনিক ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জামও রয়েছে।

কিন্তু তবু দত্তদা আশাবাদী........। তিনি জানেন যে পেশাদার জ্যোতির্বিদরা তাদের পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করবেন খুব অস্পষ্ট তারাদের, ছায়াপথস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী এবং দূরবর্তী কোয়াসার। এই কারণেই ধূমকেতুর মত কম তাৎপর্যপূর্ণ কিছু হয়ত তাদের চোখ এড়িয়ে যাবে— তাছাড়া তাদের সচরাচর তা পর্যবেক্ষণ করার কথাও নয়। মূলতঃ এই কারণেই সৌখিন বা অপেশাদারী জ্যোতির্বিদরা এমন অনেক ধূমকেতু আবিষ্কার করতে পেরেছেন যা পেশাদার জ্যোতির্বিদদের নজর এড়িয়ে গেছে।

দত্তদার কেন জানি মনে হচ্ছিল আজকের রাতই— সম্ভবত হবে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি।

অবশ্য তার একটা কারণও রয়েছে। "সেই একই পুরানো তারাদের" পটভূমিতে দত্তদা একটা অস্পষ্ট আগন্তুককে চিহ্নিত করেছেন। ভাল করে তিনি তার পরিসংখ্যান তালিকাটি আবার পরীক্ষা করে দেখলেন—দিব্যর দিকে ভাল করে নজর করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন যে তার দেখবার কাঁচের ওপর কোন দাগ বা নোংরা লেগে আছে কিনা। তারপর টর্চটা জেলে তার ছোট্ট ক্যালকুলেটার দিয়ে কিছুটা হিসাব করলেন। দত্তদা তার দৈনন্দিন জীবনে উদাসীন বা ভুলো মনের লোক হলেও এসব ব্যাপারে খুবই সতর্ক এবং অভিজ্ঞ।

নাঃ! কোন ভুল নেই। যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। যার দিকে তিনি এতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন তা আগে আকাশে ছিল না। এটি একটি নতুন ধূমকেতু বলেই তার মনে হল। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে দত্তদা তবু বার বার তাকে পর্যবেক্ষণ করে যেতে লাগলেন।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে দত্তদা দেখেই যেতে লাগলেন যতক্ষণ না রাতের আকাশ স্বল্প আলোয় আলোকিত হয়ে পর্যবেক্ষণ করার ছেদ ঘটালো। দত্তদার বাড়ীর কাছেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তখন মানুষের যাতায়াত সুরু হব হব করছে। বেলুড় মঠেও তাই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের নির্জন নিস্তব্ধতা চলে গিয়ে কলকাতা আবার কর্মপ্রবাহে চঞ্চল হয়ে উঠবে।

দত্তদা দিব্যকে গুটিয়ে নীচে নেমে এলেন।

দুদিন বাদে আনন্দবাজার পত্রিকায় বড় করে একটা খবর ছাপা হল ঃ—

জনৈক কলিকাতাবাসী কর্তৃক নতুন এক ধূমকেতু আবিষ্কার

বিশেষ সংবাদদাতা

'শ্রীমনোজ দত্ত নামক জনৈক উত্তর কলিকাতা নিবাসী এক নতুন ধূমকেতু আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেছেন। দত্ত দুটি রাত্রিতে এই নতুন ধূমকেতুটিকে দেখতে পেয়েছেন এবং তার বিশদ বিবরণী ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এ্যাসট্রোফিজিক্‌স্ এ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কাভালুরে আই আই এ-র (I. I. A.) একটি 90 ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে যা এশিয়ার সর্ববৃহৎ একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র। আই আই এ যদি মনোজ দত্তের আবিষ্কারকে যথার্থ বলে স্বীকৃতি দেয় তবে তা সৌখীন জ্যোতির্বিদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য এবং মূল্যবান প্রাপ্তি হিসাবে পরিগণিত হবে। বন্ধু এবং গুণগ্রাহীমহলে 'দত্তদা' নামে সুপরিচিত এই ভদ্রলোক মনে করেন যে পরবর্তী কয়েকমাসের মধ্যেই এই ধূমকেতুটিকে খালি চোখেও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। দত্ত বাবু এই আবিষ্কারের পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছেন তার আট ইঞ্চির ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে যার নাম তিনি দিয়েছেন —"দিব্য"।'

এর পর মাত্র এক সপ্তাহ লাগলো 'কমেট দত্ত'কে স্বীকৃতি দিতে। আই. আই. এ দত্তদার আবিষ্কারকে পূর্ণ সমর্থন করে সারা বিশ্বকে জানিয়েও দিল। আর প্রচলিত প্রথা অনুসারে আবিষ্কারকের নাম অনুসারে ধূমকেতুটির নাম রাখা হল 'কমেট দত্ত'।

দত্তদার জয়জয়কার পড়ে গেল। বেচারী দত্তদা! চুপচাপ এক কোণে পড়ে থাকতে অভ্যস্ত দত্তদার কাছে তা এক মহা সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। একের পর এক অভিনন্দন আর সম্বর্ধনা সভায় তাকে যোগ দিতে হল—যেখানে লোকেরা ধূমকেতু কি বস্তু না জেনেই এবং জ্যোতির্বিদ্যা আর জ্যোতিষবিদ্যা গুলিয়ে ফেলে বক্তৃতার বন্যা ছোটাতে লাগলো। এই রকম একটা অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে বিরক্ত হয়ে দত্তদা ইন্দ্রাণী দেবীকে বললেন—এখন মনে হচ্ছে আবিষ্কারটা বোধহয় না করলেই পারতাম।

—আমিও ঠিক তাই ভাবছি। যদিও আমার কারণটি অন্য। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কেন একথা বলছো। জানিতো তুমি এসব লোকজন-সভা-সমিতি পছন্দ করোনা।

ইন্দ্রাণী দেবীও তাকে সমর্থন জানালেন দেখে দত্তদা একটু

বিস্মিত হলেন। বললেন—ঠিক বলেছো। অবশ্য যে সম্মান এবং স্বীকৃতি আমি পাচ্ছি তার জন্যে বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে আমরা ভারতীয়েরা সব ব্যাপারেই একটু বাড়াবাড়ি করি। বিজ্ঞান, খেলাধূলা, শিল্প কিংবা প্রতিভাকে অবশ্যই প্রশংসা করা দরকার। কিন্তু তা যথাযথ হওয়া উচিত। আসলে কি জান আমাদের সমাজ মহত্ত্বকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখার দৃষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য আমার মত অল্প কিছু লোকই সম্ভবত এইভাবে ভাবে। কিন্তু সত্যি করে বলতো আমি এটা আবিষ্কার না করি তা তুমি চেয়েছিলে কেন?

—ধূমকেতু বিপর্যয় আর অমঙ্গল নিয়ে আসে। তাই আমি চাইনি তোমার মত একজন ভাল লোক এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক—ইন্দ্রাণী দেবীর কণ্ঠে উদ্বেগের সুর ফুটে উঠলো।

দত্তদা হাসলেন। বললেন—এম. এ ডিগ্রীও দেখছি তোমার মনের কুসংস্কারকে দূর করতে পারেনি। ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটার কোন সম্পর্ক নেই। অপরপক্ষে বলতে গেলে ধূমকেতুকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে এবং তাদের গঠন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারা যায়। তাদের মধ্যে ক্ষতিকারক কিছু নেই। তারা অভিকর্ষের শক্তিতে একটি সহজাত চলচ্ছক্তি দ্বারা অনৈচ্ছিকভাবে পরিক্রমা করতে থাকে। মানুষের ওপর তাদের কোন ঐশ্বরিক বা অমঙ্গলকর পৈশাচিক প্রতিক্রিয়া নেই। তুমি দেখবে আমার এই ধূমকেতু কারুর কোন শঙ্কার উদ্রেক না করেই আবার চলে যাবে।

*　　*　　*　　*

কেম্ব্রিজের কিংস কলেজের বিশাল ভোজন কক্ষটিতে ভোজনপর্ব এই মাত্র শেষ হল। ছাত্রেরা কিছুটা আগেই তাদের গতানুগতিক রাতের খাওয়া শেষ করে পড়াশোনা বা গল্প গুজব করার জন্যে চলে গেছে। কলেজ-শিক্ষকগণ নানান পদের খাবার একটু তারিয়ে তারিয়ে বেশী সময় ধরে খেয়ে ওয়াইন রুমে গিয়ে আরাম করে বসেছেন। সুদৃশ্য ট্রলিতে এক রাউণ্ড পানীয় তখনও শেষ হয়নি এমন সময় খানসামা এসে অধ্যক্ষের কানে ফিসফিস করে কি বলে রূপোর ট্রেতে রাখা একটা খাম এগিয়ে দিল। অধ্যক্ষ মহাশয় খামটা খুলে একটু দেখে চিঠিটা জেমস-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—জিম আজ রাতের ক্লারেটে আর তোমার খাওয়া হচ্ছে না। তোমার ঘরে একজন অপেক্ষা করছেন। তোমাকে যেতে বলেছেন।

জেমস গিবস-এর তৈরী ভারী সুন্দর বিশাল বাড়ীটার দিকে যেতে যেতে চিঠিটায় একবার চোখ বোলালেন। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি—লেখা রয়েছে ঃ—

প্রিয় ডঃ ফরাসিথ, এই চিঠির পত্রবাহককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে আজ রাতেই আমার লণ্ডন অফিসে নিয়ে আসতে। অনুগ্রহ করে দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন। রাতে লণ্ডনে আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছি।

এভাবে আপনাকে অসুবিধার ভেতর ফেলাতে খুবই দুঃখিত। আপনাকে কেবল অনুরোধ আপনার এখানে আসার খবরটা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখবেন। বিশ্বাস করুন সেটা খুবই প্রয়োজন।

আপনার বিশ্বস্ত
জন ম্যাকফারসন

স্বাক্ষরের তলায় পরিচয়টা স্পষ্ট করে লেখা—"ডিফেন্স সাইন্স এ্যাডভাইসার, হার ম্যাজেসটিস্ সার্ভিস।"

জেমস তার বসবার ঘরে ঢুকতেই গোলাকার পশমী টুপি পরা এক ভদ্রলোক এসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল—স্যার, আমার নাম জনসন। আমি হোয়াইট হলের একজন সিকিউরিটি অফিসার। জনসন জেমসকে তার পরিচয় পত্রটি দেখিয়ে আবার বলল—আশা করি আমি কেন এখানে এসেছি তা আপনি জেনে গেছেন।

জবাবে জেমস বললেন—হ্যাঁ—চিঠিতে যা লেখা আছে ততটুকুই। তিনি জানতেন যে জনসনকে কিছু জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। তাই বললেন—তৈরী হয়ে নিতে আমার বেশী সময় লাগবে না। আপনি কি একটা শেরী খাবেন ততক্ষণ?

—ধন্যবাদ! যখন গাড়ী চালাই তখন কোন পানীয় আমি খাই না। জনসন জবাব দিল।

জেমস তাড়াতাড়ি করে একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র পুরে জনসনের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। সামনের লনটা গাড়ীতে পেরোবার সময় সেণ্ট মেরী চার্চ থেকে রাত 9টার ঘণ্টা শোনা গেল।

লণ্ডনে যাবার জন্যে এম-11 রাস্তা ধরে জনসনের ফোর্ড কর্টিনা 90 মিনিটেরও কম সময়ে হোয়াইট হলে পৌঁছে দিল। গাড়ী থেকে নেমে বিশাল করিডোর পেরিয়ে জন ম্যাকফারসনের চেম্বারে যেতে তাদের আরো দশ মিনিট সময় লাগলো। ঘরে ঢুকে জেমস-এর সঙ্গে স্যার জনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে জনসন চলে গেল।

—'ডঃ ফরাসিথ এভাবে আপনাকে অসময়ে ডেকে আনার জন্যে দুঃখিত'—স্যার জন চেয়ার থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে জেমস-এর কোট আর স্কার্ফ খুলতে সাহায্য করে আবার বললেন—বেশী সময় নষ্ট না করে আমি সরাসরি কাজের কথায় আসছি। একটা টাইপ করা লেখা স্যার জন জেমস এর দিকে এগিয়ে দিলেন।

লেখাটা দেখেই প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে জেমস বলে উঠলেন—আরে এটা তো আমারই একটা লেখা—নেচার পত্রিকায় দিয়েছিলাম। কিন্তু এই মূল পাণ্ডুলিপিটা আপনি পেলেন কি করে? কথাগুলো বললেও জেমস মনে মনে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তবে কি এরা তার ওপর নজর রাখছে।

স্যার জন জেমস-এর আশঙ্কার কথা আন্দাজ করে তাকে

ডঃ ফরসিথ এভাবে আপনাকে...

আশ্বস্ত করার জন্যে বললেন—ভাববেন না আমরা আপনার ওপর গোপন নজরদারি চালাচ্ছি। আসলে নেচার পত্রিকার সম্পাদক আমার বিশেষ বন্ধু। আমরা ট্রিনিটিতে একসঙ্গে ছিলাম আর এখনও প্রায়ই রিফর্ম ক্লাবে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। স্যার জন স্পষ্ট করে না বললেও জেমস বুঝতে পারলেন যে "ট্রিনিটি" বলতে স্যার জন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের কথাই বললেন।

ব্যাপার স্যাপার জেমস কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলেন না। কিছুটা উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন—স্যার জন আমি জানতে পারি কি পাণ্ডুলিপিটি কিভাবে আপনি পেলেন? এর বক্তব্য বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি নেচার পত্রিকাকে এটা খুব তাড়াতাড়ি ছাপতে বলেছিলাম।

—আমি আপনার সঙ্গে একমত যে লেখাটা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ এবং এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা ছাপা ঠিক হবে না—অবশ্য এর বক্তব্য অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়—গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথাগুলো বলে স্যার জন পাইপটা ধরালেন।

জেমস তার গবেষণার যথার্থতা সম্পর্কে এবং লেখাটা ছাপা যাবে না বলে স্যার জনের মন্তব্য কিছুতেই সহ্য করতেন না। কিন্তু জেমস জানেন যে স্যার জন একজন খুবই অভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাভাজন বৈজ্ঞানিক। তাই তাঁর এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে প্রকৃত কারণটা কি তা জানতে উৎসুক হলেন।

স্যার জন দুবার মৌজ করে পাইপটা টেনে আবার সুরু করলেন—অনুগ্রহ করে আমাকে ভুল বুঝবেন না ডঃ ফরসিথ। আজকে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ক্লাবে আমার নেচার পত্রিকার সম্পাদক টেলরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং টেলরই আমাকে আপনার এই লেখাটা দেখায়। আপনি জানেন কিনা জানি না তবে আমি এখনও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই আগ্রহী এবং উৎসাহী। আর টেলর সম্ভবত সেই কারণেই আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আরো কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মতামত যাচাই করে নেবার আগে আমার মতামত জানতে চেয়েছিল। লেখাটা পড়েই আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনার সিদ্ধান্ত সত্য হলে বিশ্বব্যাপী তার একটা নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা।

জেমস আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। কিছুটা ক্ষোভ এবং উষ্মার সঙ্গে বললেন—আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি যে আমার সিদ্ধান্ত সঠিক। আর তার জন্যে আমি আমার সুনাম এবং অভিজ্ঞতার বাজী রাখতে পারি।

স্যার জন বললেন—গাগনিক বিদ্যায় অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের জন্যে আপনার প্রভূত প্রসিদ্ধি থাকলেও আপনার সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হলে আমি খুশী হতাম। আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন আপনার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হলে মানে কমেট দত্তের সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা লাগলে কি ঘটতে পারে?

—ফল খুবই মারাত্মক এবং ভয়াবহ হবে। আর সেই জন্যেই আমি খুবই সতর্কতা এবং যত্ন নিয়ে সব দিক বিচার করে দেখেছি। কতকগুলি বিশেষ অবস্থা না ঘটলে এই সংঘর্ষ অনিবার্য।—জেমস-এর কথায় যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

স্যার জন জেমস-এর শেষের কথার সূত্র ধরে আবার জিজ্ঞেস করলেন—সেই বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলো কি হতে পারে?

—পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবার আগেই কোন উপগ্রহের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগতে পারে। কিংবা সূর্যের কাছে এসে তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে অথবা একেবারে বাষ্পীভূত হয়ে উবে যেতে পারে।

—কিন্তু ডঃ ফরসিথ আমরা তা ঘটলেও ঘটতে পারে এমন কোন সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের এই ভেবেই ব্যবস্থা নিতে হবে যে কমেট দত্তর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হবে। আমরা অবশ্য জানি যে ধূমকেতুর সঙ্গে এই ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা খুবই বিরল—এক কোটি বছরে তা একবারই ঘটতে পারে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এখন আমরা জানতে পেরেছি যে পরবর্তী এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে চলেছে এক বছরের মধ্যেই।

—সঠিক বলতে গেলে তারও কম সময়ে - দশ মাসের মধ্যেই—জেমস স্যার জনের ভুল শুধরে দিলেন।

স্যার জন বললেন—ভুল শুধরে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। আপনি ভেবে দেখেছেন সারা পৃথিবীতে সমস্ত জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে আর মাত্র দশ মাস। কারণ মুখোমুখি সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে অংশটি ধূমকেতুর সামনে পড়ছে কেবলমাত্র সেটাই ধ্বংস হবে না। ব্যাপকভাবে বায়ুমণ্ডলে বাষ্পীভবন ঘটবে এবং ফলশ্রুতিতে সকল জীবিত প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে—

এবং তা ঘটবে এই মুখোমুখি সংঘর্ষের সামনে পৃথিবীর যে অংশ পড়ছে না সেই অংশেও। আপনি কি মনে করেননা এই মারাত্মক ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্যে আমাদের কিছু করা উচিত ?

জেমস-এর মুখে একটু চাপা হাসি ফুটে উঠলো। মনে মনেই ভাবলেন—পাকা বুরোক্র্যাটিক মনোভঙ্গী। ভাবখানা যেন ব্যাপারটা একটা কেবল আইনশৃঙ্খলা কিংবা কোন দুর্ঘটনার মোকাবিলার ব্যাপার। ভাবলেও জেমস মুখে বললেন —কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি কি কিভাবে আমরা এই বিপর্যয়কে রুখতে পারবো ?

স্যার জন বললেন —সত্যি বলতে কি আমিও তা জানি না। কিন্তু চেষ্টা ছাড়া আমাদের আর উপায় কি আছে বলুন! আমার মনে হয় কি করা দরকার তা ঠিক করতে আমাদের দুজনের চাইতে অনেক বেশী লোকের বুদ্ধির দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা জরুরী আলোচনা করা দরকার এবং তা করতে হবে খুবই গোপনে। স্যার জন জেমস-এর পাণ্ডুলিপিটার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন —ভাবুন তো এই সাংঘাতিক খবরটা যদি কোনভাবে জানাজানি হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে কি দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হবে ?

—কিন্তু স্যার জন—আমার এ লেখাটা চেপে রেখে তো সত্যকে গোপন রাখা যাবে না। আজ হোক বা কাল হোক অন্য অনেক বিশেষজ্ঞ আমার মত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।

স্যার জন বললেন —না—আপনার লেখাটা চেপে রাখতে বলছি না। কিন্তু এর সুরটা একটু নরম করুন। আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেক "হতে পারে" বা "নাও হতে পারে" গোছের শব্দ যোগ করে এমনভাবে লিখুন যাতে আপনার সিদ্ধান্তটা লোকেদের চূড়ান্ত বলে মনে না হয়। অন্যান্য সব দেশের বন্ধুদেরও কিছুদিনের জন্যে এ ব্যাপারে কোন খবর যাতে রেখে ঢেকে ছাপা হয় তা নিশ্চিত করতে আমি আমার প্রভাব খাটাব।

কিছুটা অধৈর্য হয়ে জেমস জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু কতদিন ধরে তা করবেন। স্যার জন বললেন—যতদিন না এই ধূমকেতু নিরাপদে আমাদের পৃথিবী থেকে সরে যায়। আর সময় নষ্ট না করে আসুন প্রস্তাবিত এই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ভাবছি এখানেই এক সপ্তাহের মধ্যে তার আয়োজন করবো।

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি গোপনীয় সম্মেলন এক সপ্তাহের মধ্যে ? জেমস মনে মনে ভাবলেন তা অসম্ভব। কিন্তু স্যার জন সম্ভবতঃ মনে মনে একটা ছক তৈরী করে ফেলেছিলেন ইতিমধ্যেই। সম্মেলন কিভাবে করা হবে সে সম্পর্কে তিনি জেমসকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

আলোচনা সভা সাঙ্গ হবার পর স্যার জন যখন জেমসকে রিজেন্ট স্ট্রীটে তার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তখন ঘড়িতে রাত 1টা। রাস্তা জনশূন্য-নির্জন। হোটেলের জানলা দিয়ে জেমস তারাভরা আকাশের দিকে তাকালেন। তিনি ভাবলেন এদের মধ্যেই কোনখানে রয়েছে কমেট দত্ত যে পৃথিবীকে আঘাত করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আজকের এই শান্ত নির্জন রাতে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে কি নিদারুণ—একটা বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছে? জেমস আবার ভাবলেন তিনি তার গণনা কি সঠিক করেছিলেন!

এক সপ্তাহের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন আয়োজন করার ব্যাপারে স্যার জনের দক্ষতা সম্পর্কে জেমস-এর মনে যেটুকু সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে গেল সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত হয়ে। বিস্ময়ে জেমস দেখলেন বিশ্বের যে সমস্ত বিশেষজ্ঞদের ডাকবার কথা ছিল তাদের সবাই উপস্থিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, স্পেস টেকনোলজিস্ট, বায়োলজিস্ট—সবাই এসে হাজির। আর স্যার জনের বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে এসেছেন মনোজ দত্ত— যিনি এই নাটের গুরু।

অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই সম্মেলন চললো এক সপ্তাহ ধরে। প্রথমেই বিশেষজ্ঞগণ কমেট দত্ত সম্পর্কে সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ডঃ জেমস ফর্সাইথ-এর গণনার ফলাফল মিলিয়ে বার বার আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং গণনা করে দেখলেন। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন যে জেমসই ঠিক। সরাসরি সংঘর্ষ সম্পর্কে তিনি যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন তা এড়ানো যাবে না।

পৃথিবীকে আলতো একটু স্পর্শ করে কমেট দত্ত চলে যাবে এবং কোন সরাসরি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটবে না এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে তা হলে অবশ্য পৃথিবীর জীবন ও সম্পত্তি পুরোপুরি ধ্বংস হতো না। তাই দৈবাৎ আশাপ্রদ কিছু ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনার জন্যে তো বসে থাকা যায় না।

সম্মেলনে স্থির হল এর বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে। কিন্তু কিভাবে করা হবে? বিশেষজ্ঞেরা একদিন মাটির নীচে বাঙ্কারে মানুষদের থাকার মত আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নাকচ করে দিলেন। কারণ হিসাবে বলা হল যে তা প্রযুক্তিগতভাবে জীববিজ্ঞানের দিক থেকে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে একটা খুব বাস্তব প্রস্তাব নয়। কাজেই একটাই পথ সামনে রয়েছে। আর তা হল এর বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অনেক আলাপ আলোচনার পর কি করা হবে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত হলেন। ঠিক হল যে কমেট দত্তকে ধাক্কা দিয়ে তার গতিপথ থেকে সামান্য একটু সরিয়ে দিতে হবে।

এই বিশাল এবং দুরূহ কাজের জন্যে কি পরিমাণ

পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজন তা বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করে বার করলেন। বলা হল যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ঠিকমত-ভাবে উপযুক্ত স্থান থেকে প্রয়োজনীয় সময়ে যদি একটা প্রচণ্ড পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো যায় তবে তা থেকে অভীষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এটা সম্ভব একটা মহাকাশ জাহাজে পারমাণবিক বস্তু রেখে তাকে মহাকাশে প্রেরণ করে ধেয়ে আসা ধূমকেতুটিকে পথিমধ্যে রোধ করে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে উচ্চ শব্দে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো। অবশ্য সতর্ক করে বিশেষজ্ঞেরা বললেন—এতে যে সাফল্য লাভ করা যাবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না কারণ সমস্ত ব্যাপারটি সব দিক থেকে নিখুঁত না হলে পুরো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। অবশেষে কিভাবে করা হবে সে সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত কর্মপদ্ধতি স্থির করা হল। তাতে বলা হল ঃ—

অক্টোবর 10—পারমাণবিক বস্তু সহ মহাকাশযান প্রেরণ —অবশ্য তার মধ্যে যদি কোন প্রাকৃতিক কারণে ধূমকেতুটি নষ্ট না হয়ে যায় বা কোন অজ্ঞাত কারণে তার গতিপথের পরিবর্তন না ঘটে।

নভেম্বর 5—পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে ধূমকেতুর সঙ্গে মোলাকাত এবং মহাকাশ যানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ।

ডিসেম্বর 15—উক্ত প্রচেষ্টা যদি ফলপ্রসূ না হয় তবে এই দিনটিই হবে সেইদিন যখন কমেট দত্ত এসে পৃথিবীকে ধাক্কা মারবে। আর যদি প্রচেষ্টা সঠিক হয় তবে এই দিনে কমেট দত্ত পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব দিয়ে পেরিয়ে যাবে।

উল্লিখিত প্রচেষ্টার সাফল্য আবার নির্ভর করবে ধূমকেতুটি কত বৃহৎ তার ওপরে। তা আসলে যে কত বিশাল হবে তা কেউ আন্দাজ করতে পারেন নি। তবে প্রত্যেকের মনের আশা যাতে তা খুব বড় না হয়।

দত্তদা স্যার জন ম্যাকফারসন-এর অভিমত জানার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কি মনে হয় যে আমরা সফল হব? এই এক সপ্তাহে দুজনের মধ্যে এক গভীর প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে পড়েছে।

স্যার জন জবাব দিলেন—মিঃ দত্ত। আপনি যদি সত্যি সত্যি শুনতে চান তবে বলি যে 15ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি কোন ক্রীসমাসের উপহার কিনছি না।

সম্মেলনের পর দত্তদা দু সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ দ্বীপে প্রচুর ঘুরে বেড়ালেন এবং বিভিন্ন মানমন্দির পরিদর্শন করে ও শখের এবং পেশাদার জ্যোতির্বিদদের সঙ্গে মত বিনিময় করে খুব ভালই কাটালেন। দেশে ফিরতেই যা আশা করেছিলেন দেখলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রচুর বন্ধু-বান্ধব সামাজিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র এবং নানান ব্যক্তি বিমান বন্দরে এসে হাজির হয়েছেন। গলায় মালার পাহাড় নিয়ে সাংবাদিকদের

তোমার মঙ্গলের জন্যেই যজ্ঞের আয়োজন করেছি।

নানান প্রশ্নবাণের মধ্যেই তিনি কোনমতে এসে গাড়ীতে চড়ে বসলেন।

বাড়ীতে পা দিতেই দত্তদা একটু থমকে গেলেন। দেখলেন এক বিশাল প্যাণ্ডেল আর প্রচুর লোকের সমাগম। দত্তদা ইন্দ্রাণী দেবীর দিকে প্রশ্নের ভঙ্গীতে চাইলেন একটু। তিনি কি জানেন না যে দত্তদা ভীড় ভার পছন্দ করেন না। ইন্দ্রাণী দেবী একটু অস্বস্তির সঙ্গে এই প্যাণ্ডেল আর ভীড়ের কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন—তোমার মঙ্গলের জন্যে আমি একটা যজ্ঞের আয়োজন করেছি। যজ্ঞের পর পুরুত মশাই তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

দত্তদা একটু উষ্মার সঙ্গে বললেন—কিন্তু কেন? আমি বিদেশে গিয়েছিলাম বলে? তুমি কি জান না যে বিদেশ যাত্রা এখন আর একটা নিষিদ্ধ বা অপবিত্র ব্যাপার বলে মনে করা হয় না। সবচেয়ে বড় কথা এইসব অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার মনোভাব তুমি তো ভাল করেই জান।

ইন্দ্রাণী দেবী সমর্থন পাবার জন্যে দত্তদার ছোট ভাই শিবাজীবাবুর দিকে তাকালেন। শিবাজীবাবু দাদাকে ভাল করেই জানেন। তবু একটু তৈরী হয়ে কেশে কারণটা ব্যাখ্যা করার জন্যে বললেন—বিদেশ যাত্রার জন্যে নয়। তুমি যবে থেকে ওই ধূমকেতু আবিষ্কার করেছো তবে থেকেই আমরা সবাই ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছি। ধূমকেতুর সঙ্গে যে অশুভ শক্তি রয়েছে তাকে নষ্ট করতে গুরুজী শান্তিযজ্ঞের উপদেশ দিয়েছেন। তুমি এসে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করবে বলে

আমরা সবাই অপেক্ষা করে রয়েছি।

দত্তদা রাগে ফুঁসছিলেন মনে মনে। রাগ চেপে তবু জিজ্ঞেস করলেন— এই যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ ফলাফল কি ?

—তুমি যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেছো পৃথিবীর ওপর তার কোন অশুভ প্রতিক্রিয়া হবে না এতে।

কথাটা শুনে দত্তদা আর রাগ সামলাতে পারলেন না। গলা চড়িয়ে বললেন—তোমরা কি জান না এসব কুসংস্কার মাত্র। আগেকার দিন হলেও না হয় কথা ছিল যখন ধূমকেতু সম্পর্কে লোকের কোন ধারণাই ছিল না। এখন তো আর তা নেই। লোকে এখন ধূমকেতু সম্পর্কে ভাল করেই জানে। গণিত শাস্ত্রের গণনার দ্বারা তার গতিপথ সম্পর্কে নির্ভুলভাবে জানা যায় এবং পারিসাংখ্যিক বিশ্লেষণের দ্বারা তা সঠিকভাবে প্রমাণও করা যায়। আর তোমরা যা ভাবছো তা না— ধূমকেতুর আগমনের সঙ্গে পৃথিবীতে অমঙ্গল ঘটার কোন সম্পর্কই নেই। অবশ্য এসব কথা তোমাদের বলা আর না বলা দুই সমান। কারণ তুমি বা তোমার মত লোকেরা তো বিজ্ঞানের প্রাথমিক কোন বইও পড়ে দেখোনি।

শিবাজীবাবু বিনয়ের সঙ্গেই দাদার যুক্তি খণ্ডন করতে বললেন– কিন্তু আমাদের জ্ঞানীগুণী পূর্বপুরুষেরা তো এই ধরনের যজ্ঞের কথাই বলে গেছেন।

দত্তদা বললেন—শিবাজী—সময় সময় আমার মনে হয় এই সমস্ত নিরর্থক আচার অনুষ্ঠান অন্ধের মত পালন করে আমরা আমাদের অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী পূর্বপুরুষদের অসম্মানই ক'রে থাকি। একবার উপনিষদের যুগে ফিরে যাও— দেখতে পাবে তাঁদের অনুসন্ধিৎসার মনোভাব কতখানি ছিল। সেই অনুসন্ধানী এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাব আজকের যে কোন বিজ্ঞানীদের প্রশংসাই পাবে। প্রকৃতি সম্পর্কে, সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বিশদে জানতে তাঁদের ছিল গভীর আগ্রহ এবং তাঁরা কোন জিনিস কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে মেনে নেন নি। কালক্রমে আমরা সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে ফেলেছি বলে আজ আমাদের এই অবস্থা। অবশ্য আমার এসব কথা বলে লাভই বা কি। তবে তোমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমি তোমাদের এইসব আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছি না কারণ আমি মনে করি তা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না। কথাগুলো বলে দত্তদা বাড়ীর ভেতরের দিকে তার পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

লণ্ডন থেকে ফেরার পর থেকে দত্তদা নিয়মিতভাবে স্যার জন ম্যাকফারসনের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। দুজনের নানান গুণের জন্যে অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ে উভয়ের খুই কাছে চলে এসেছেন তারা। স্যার জন দত্তদার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল– অপরদিকে দত্তদাও স্যার জনের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং শৃঙ্খলাবোধের প্রতি দারুণভাবেই আকৃষ্ট। কিন্তু মজার কথা স্যার জন এতই হুঁশিয়ার যে পাছে কোনভাবে জানাজানি হয়ে যায় এই আশঙ্কায় কখনই চিঠিতে প্রোজেক্ট লাইট বিগ্রেডের কথা উল্লেখ করেন না। তবে সে সম্পর্কে এমন একটা কায়দা করে লেখেন যার আসল অর্থ দত্তদার বুঝতে অসুবিধা হয় না।

টেনিসনের কবিতার একজন প্রচণ্ড ভক্ত বলে স্যার জন কমেট দত্তর প্রতি প্রস্তাবিত ঐ আক্রমণাত্মক গোপন অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম "প্রোজেক্ট লাইট ব্রিগেড" দেবার প্রস্তাব এনেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে সারা বিশ্বের প্রতিটি জাতিই মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নিজেদের ভেতরকার সব রেশারেশি এবং শত্রুতা ভুলে সর্বতোভাবে প্রজেক্ট-এর কাজে সহায়তা করছিল।

কমেট দত্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের স্থিরীকৃত নির্দিষ্ট পথ ধরেই এগিয়ে আসছিলো। ক্রমে ক্রমে তার পুচ্ছটিও তৈরী হয়ে গেল। ভেঙে না গিয়ে কমেট দত্ত সূর্যের চারিধারে ঘুরতে লাগলো এবং সকলের আশায় ছাই দিয়ে তা বাষ্পীভূত হয়ে উবেও গেল না বা দৈবক্রমে কোন উপগ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষে তার গতিমুখের কোন পরিবর্তনও ঘটলো না। প্রজেক্ট লাইট বিগ্রেডের বৈজ্ঞানিকরা বুঝতে পারলেন যে মুখোমুখি সংঘর্ষের যে সম্ভাবনা আন্দাজ করা হয়েছিলো তা এবার বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মারাত্মক বিপদের ঘটনাকে তারা সম্পূর্ণভাবেই গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যাপারটা এতই গোপনীয় রাখা হয়েছিল যে প্রজেক্টে যারা কাজ করছেন তারা ছাড়া তাদের নিকটতম অন্যান্য খুব নিকটতম সহকর্মীরাও এই বিপদের কথা জানতেন না। প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছেন যে কমেট দত্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে এক অনবদ্য দৃশ্যের অবতারণা করে চলে যাবে এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে রেখে যাবে এক বিশাল তথ্য-ভাণ্ডার।

অবশ্য কমেট দত্তের আগমনের সঙ্গে সাধারণ জনগণের মনে ধূমকেতু সম্পর্কে কুসংস্কার সঞ্জাত ভীতি এবং আশঙ্কাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সারা পৃথিবীতে তাতে আরো বেশী করে ইন্ধন জোগাতে লাগলো জ্যোতিষ এবং তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা। এমনকি পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতেও তার ব্যতিক্রম হল না।

অক্টোবরের মাঝামাঝি দত্তদা স্যার জনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। রয়েল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটির মিটিং, ইংলণ্ডের বর্তমান আবহাওয়া, মরশুমের প্রথম ফুটবল ম্যাচ, সাম্প্রতিক উপনির্বাচন প্রভৃতি নানান খবরের মাঝে দত্ত বাবু যে খবরটির জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে আসছিলেন তা খুঁজে পেলেন ঃ—"লাইট ব্রিগেড আক্রমণের প্রস্তুতি সুরু করেছে। আশা করব সব যেন ভালয় ভালয় মিটে যায়।" তাহলে ঠিক সময়ে মহাকাশযান পাঠান হয়েছে। কিন্তু তবু দত্তদার আশঙ্কা গেল না। ভাবলেন পরিকল্পনা মাফিক

সময়মত সঠিক স্থানে সে কি যেতে পারবে? রিমোট কন্ট্রোলে বিস্ফোরণ ঘটানো যাবে তো? যদি তা ঠিকমত কার্যকরী না হয়? দত্তদা মনে মনে ভীষণভাবে উত্তেজিত এবং চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

অথচ দত্তদা তার মনের আশঙ্কা এবং ভাবনার কথা কাউকেও বলেননি। মনের এই অবস্থাতেইতাকে ওপর ওপর দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং অন্যান্য সব উৎসবে যোগ দিয়ে খুশী খুশী ভাব দেখাতে হচ্ছিল। ভুলে থাকবার জন্যে দিনের বেলা তিনি তার আট বছরের নাতি খোকার সঙ্গে সময় কাটাতে লাগলেন। আর রাতে—বলাই বাহুল্য যে গভীর আগ্রহে দিব্যর মধ্যে দিয়ে তিনি আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন।

দত্তদা নিয়মিতভাবে ধূমকেতুর গতিপথ লক্ষ্য করে চলেছেন। এখন কমেট দত্তকে খালি চোখেও স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে। 16ই নভেম্বর, তিনি আরো মনোযোগ দিয়ে কমেট দত্তকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলেন। তার গতিপথ এবং স্থান বদল হয়েছে, দত্তদার মনে হল যেন একটু পাল্টেছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন এটা তার মনের শুভ একটা ইচ্ছামাত্র। বিস্ফোরণ যদি সফলও হয়ে থাকে তাহলেও মূল গতিপথ থেকে ধূমকেতুর সরে যাওয়া কখনই লক্ষ্য করা যাবে না। কিন্তু কি ঘটলো তা জানতে তার আর ধৈর্য থাকছিল না।

দত্তদাকে অবশ্য বেশীদিন উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হল না। 18ই নভেম্বর কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে স্কুটারে করে একজন বিশেষ বার্তাবহ তার জন্যে একটা খুব জরুরী টেলেক্স নিয়ে এলো। টেলেক্সটা পেয়ে টেলেক্স অপারেটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না যে খবরটার ভেতর এমন কি গুরুত্ব আছে যাতে এটা খুবই জরুরী ব্যাপার হতে পারে?

কিন্তু খবরটা পড়ে দত্তদা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন এবং রসগোল্লা কেনবার জন্যে দোকানে ছুটলেন। টেলেক্স মেসেজে লেখা ছিলঃ—"এখন আমি নিশ্চিত যে 15ই ডিসেম্বর ক্রীসমাসের উপহার কিনতে যাবই।"— জন ম্যাকফারসন।

15ই ডিসেম্বর কমেট দত্ত পৃথিবীর খুব নিকটে চলে এল—প্রায় 80,000 কি.মি. দূরত্বের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অবাক বিস্ময়ে কমেট দত্তকে দেখে আনন্দ পেল। কিন্তু পৃথিবীর মাত্র স্বল্প কয়েকজনই জানলেন যে সারা পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কত কাছাকাছি চলে এসেছিলো।

যখন কমেট দত্ত অনেক দূরে চলে গেল এবং তাকে আর দেখাও যাচ্ছিল না তখন দত্তদা পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন এবং স্ত্রীকে বললেন—দেখলে তো ধূমকেতু এল আর চলেও গেল। এখন বুঝতে পারলে তো তোমরা যা ভেবেছিলে এর জন্যে কোন দুর্ঘটনা বা অমঙ্গল কিছুই ঘটলো না।

—মানছি যে কিছুই হয় নি। কিন্তু যে কোন সময়ে তা হতে পারতো। এখন বলতো কি করে সব দুর্ঘটনা এবং অমঙ্গল এড়ানো গেল?—ইন্দ্রাণী দেবীর কণ্ঠে বিজয়িনীর সুর।

দত্তদা চমকে গিয়ে ইন্দ্রাণী দেবীর দিকে তাকালেন। তবে কি ইন্দ্রাণী দেবী ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবলেন তা কি করে হবে। তিনি নিজে কখনও তো তাকে প্রজেক্ট লাইট ব্রিগেডের কথা জানাননি তবু কৌতূহলী হয়ে একটু সতর্কতার সঙ্গে কারণটা জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো?

ইন্দ্রাণী দেবীর মুখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ভাবলেন আচার অনুষ্ঠানে অবিশ্বাসী স্বামীর যদি বিশ্বাস আনতে পারেন। তাই উৎসাহিত হয়ে বললেন—বারে, বিপর্যয় বা অমঙ্গল হবে কি করে? আমাদের বাড়ীতে যজ্ঞ করা হল না? দেখলেই তো চোখে।

দত্তদা আশ্বস্ত হলেন। বললেন—কিন্তু আমি তো যজ্ঞ করিনি। যজ্ঞের কোন অনুষ্ঠানেই তো আমি অংশ গ্রহণ করিনি—ভুলে গেছ নাকি?

ইন্দ্রাণী দেবী বললেন—ভুলে যাব কেন? তোমাকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি। তুমি অস্বীকার করাতে আমরা একটা উপায় বার করলাম- মানে গুরুজীই পথটা বাতলে দিলেন। উনি বললেন তুমি যজ্ঞ না করলে তোমার কোন বংশধর তোমার হয়ে যজ্ঞ করলেই চলবে। তাই তো খোকাকে দিয়ে তোমার হয়ে যজ্ঞ করালাম। আর তার ফল তো হাতে হাতেই দেখলে।

দত্তদার সামনে ছবিটা ভেসে উঠলো। আট বছরের খোকা যজ্ঞ করছে। তাকে যে মন্ত্র বলা হচ্ছে তা সে না বুঝেই উল্টোপাল্টা বলে যাচ্ছে— মাঝে মাঝে আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে—ফুল ছুঁড়ছে.......।

এর সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সম্মেলনের দাবিটাও পাশাপাশি দত্তদার চোখে ফুটে উঠলো। বিশেষজ্ঞরা সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করছেন এবং বাস্তব-সম্মতভাবে ও নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তাকে কার্যে পরিণত করছেন।

বিশ্বাস করা শক্ত যে এই দুটি চিত্রই সাম্প্রতিককালের মনুষ্য সমাজের দুটি বিপরীত মেরুর আলাদা আলাদা ছবি। দত্তদা জানেন কোন কোন কারণ ধনীদের গরীবদের থেকে পৃথক করে রেখেছে—শিক্ষিতদের অশিক্ষিতদের থেকে এবং বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগীদের সুযোগ সুবিধার সুযোগ পায় না যারা তাদের থেকে পৃথক করে রেখেছে। কিন্তু এই বিজ্ঞানসম্মত বাস্তববাদী আর অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্নদের মধ্যের পার্থক্যটি আরো অনেক ব্যাপক এবং অনেক বেশী ক্ষতি-কারক। মনুষ্য সমাজ কোনদিন কি এই কুসংস্কারকে ঘোচাতে পারবে?

উত্তরটা দত্তদার জানা নেই।

হ্যালি-হ্যালি-হ্যালি

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

নভেম্বর মাস। অল্প অল্প শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। ডক্টর ভট্টশালী এরই মধ্যে একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে বসে এক মনে কাগজে কি সব আঁকিবুঁকি কাটছেন আর থেকে থেকে ক্যাল্কুলেটর টিপে কি সব হিসেব লিখে নিচ্ছেন।

ঠিক এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল তাঁর বাল্যবন্ধু কবি শুচিস্মিতা রায়। শুচিস্মিতা কিন্তু মহিলা কবি নন, ডক্টর ভট্টশালীর মতই পুরুষ মানুষ। কিন্তু এ যুগে ছেলেমেয়ের নামকরণে আর কোন বাধা-নিষেধ নেই। সেই যে কোন্ কালে পরশুরাম তাঁর গল্পে একটি যুবকের নাম রেখেছিলেন লালিমা, তাই সে ছেলে না মেয়ে বোঝাবার জন্য তাকে নামের পাশে ব্র্যাকেটে একটা 'পুং' শব্দ ব্যবহার করতে হয়। সেকাল-কার কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দও প্রথম জীবনে লিখতেন শৈলজা মুখোপাধ্যায়। একবার একখানা পত্রিকায় তাঁকে "শক্তিশালিনী মহিলা লেখিকা" বলে তারিফ করার পর তিনি রাতারাতি নাম বদলে পুরো নাম লিখতে শুরু করেন।

কিন্তু সে-সব কোন্ যুগের কথা, এখন আর নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কারণ সবাই জানে, শীগগিরই পৃথিবীতে সকলের নামকরণই করতে হবে একটা করে নম্বর দিয়ে—জনসংখ্যা যে রকম বেড়ে গেছে তাতে আর ও ছাড়া উপায়ই বা কি?

কিন্তু যাক ওসব বাজে কথা, যে কাহিনী বলতে বসেছি তাই নিয়েই ফের শুরু করা যাক।

শুচিস্মিতাকে দেখে ডক্টর ভট্টশালী একটু বিব্রত বোধ করলেন। কিন্তু সেই কোন্ ছেলেবেলার বন্ধু, কিছু বলাও যায় না। শুধু একটু কেঠো হাসি হেসে বললেন, "চা-না কফি? তাড়াতাড়ি বল্, কোন্টা আনতে বলব। বড্ড ব্যস্ত আছি।"

শুচিস্মিতা শুচিহাস্যে মুখখানা ভরিয়ে বললেন, "না কোনটারই দরকার নেই। আজকের কাগজে একটা খবর দেখে ছুটে আসছি। তুই নাকি আবার মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছিস? এই তো সেদিন ঘুরে এলি?"

এবার ভট্টশালীর মুখে যে হাসিটা ফুটে উঠল তা কেঠো হাসি নয়, সত্যিকার আনন্দোচ্ছল হাসি। বললেন, "তুই, মনে হচ্ছে, এখনও সেই 1985 সালে পড়ে আছিস, তার পরে আরও ছিয়াত্তরটি বছর পার হয়ে গেছে বন্ধু! এটা এখন 2061 সাল। পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। সেই 1456 থেকেই ধরা যাক না। 1457, 1539, 1607, 1882। তারপর 1758 কিংবা 1759, 1835, 1910 এবং শেষ বার 1985-86। আর এবার 2061। ঠিক কিনা?

শুচিস্মিতা একটু অবাক্ হয়ে বলল, "এ সব কি বলছিস?

এ সব সাল তারিখের হিসেব নিয়ে কি করব ? আমি কি ইতিহাসের বই লিখছি ?"

"না লিখলেও জানা উচিত। কবিতা লেখা ভালো। ওতে মন ভালো থাকে, ক্ষুধার উদ্রেক হয় ; ফলে শরীরও সুস্থ থাকে। কিন্তু ঐটুকুই সব নয়। হ্যালির ধূমকেতুর নাম শুনেছিস ? এবার আবার সেটা ফিরে আসছে।"

শুচিস্মিতা একটু যেন চিন্তা করে বলল, "হ্যাঁ, হ্যালি নামে এক বিজ্ঞানী নাকি ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন কথা শুনিয়েছিলেন। যেমন, ধূমকেতুর চলাফেরা মোটেই রহস্যময় নয়, ওরাও একটা নিয়ম মেনে চলে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ঘুরে ঘুরে দেখা দেয়। তাঁর সময়ে অর্থাৎ 1862 সালে যে বড়সড় ধূমকেতুটি আকাশে দেখা দিয়েছিল সেটি আকাশের ঐ একই জায়গায় ঠিক 75 থেকে 76 বছর পর পর ফিরে আসে। 1985-র শেষে শেষ বার এসেছিল এবং তখন নাকি ওকে নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণাও করেছিলেন।

শুচিস্মিতা বলল, "আমি কিন্তু পড়ি। গোড়ার পাতা থেকে শেষ পাতায় সম্পাদক ও মুদ্রকের নাম পর্যন্ত কোন লাইন বড় একটা বাদ দিই না। তবে তোর সময় বেশি নষ্ট করব না। জানি, তুই খুব ব্যস্ত। তবু এলাম।"

"খবর আর কি ? 1985 সালে ঐ ধূমকেতুটার, যার কথা এই মাত্র বললি, তার রহস্য হ্যালি সাহেবই বার করেছিলেন, তাই ওটার নাম হ্যালির ধূমকেতু। হ্যালি ছিলেন নিউটনের সময়কার লোক, এবং নিউটনের পরম বন্ধুও বটে। শুধু ঐ একটি ধূমকেতুই নয়, প্রায় সমস্ত ধূমকেতুর রহস্যেরই আভাস তিনিই প্রথম দেন। সব ধূমকেতুই একই সময় পর পর ফিরে ফিরে আসে না। কোন কোনটা 3-4 বছর পর পরই ফিরে আসে আবার কোনটা কয়েকশ'—কয়েক হাজার —কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি বছর পর পরও ফিরে আসতে পারে। আবার এমন ধূমকেতুর কথাও জানা গেছে যারা আর কোন কালেই ফিরে আসবে না। তা ছাড়া নতুন নতুন ধূমকেতু তো প্রতি বছরই আবিষ্কার করা হচ্ছে। ধূমকেতু আবিষ্কার করা তো কোন কোন সৌখীন বিজ্ঞানীর একটা শখও বলা চলে।

"হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে 1985 সালেই জোর তত্ত্বতালাস শুরু হয়েছিল। তার আগে থেকেই তো মহাকাশে রকেট পাঠানো শুরু হয়েছিল। সে সময় জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া সব দেশ থেকেই এ নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য রকেট ছোঁড়া হয়েছিল। ইউরোপের কয়েকটা দেশ মিলে ইয়েরোপিয়ান্ স্পেস এজেন্সী নাম দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান তো এমন একটা রকেট ছুঁড়েছিলেন যা হ্যালির ধূমকেতুর মাত্র 500 কিলোমিটারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। সেটার নাম দিয়েছিলেন ওঁরা গিয়োত্তোর। গিয়োত্তোরে অবশ্য কোন মানুষ ছিল না, কিন্তু নানা রকম যন্ত্রপাতি, টেলিভিশন ক্যামেরা ইত্যাদি—সব কিছু এই এতদিন পরে আমার মনেও পড়ছে না। তা ছাড়া এই পঁচাত্তর বছর পরে ওসব মনে রাখার প্রয়োজনও হয় তো তত নেই। আমরা এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছি।"

ভট্টশালীকে বাধা দিয়ে শুচিস্মিতা বলল, "থাম্ থাম্, এক নিঃশ্বাসে অত কথা বলিস না, ভুলে যাব, তা তোরা কি করতে চাইছিস ?"

এবার আর শুধু যন্ত্রপাতি নয়, আমরা নিজেরাই ছুটছি "হ্যালির" কাছে। আমরা দু'জন— আমি আর ভেঙ্কট সুব্বা। কারণ এটা হবে পুরোপুরি ভারতীয় অভিযান। প্রথমে ঠিক হয়েছিল শ্রীহরিকোটা থেকেই আমাদের রকেট ছুটবে ; পরে ঠিক হয়েছে দীঘার কাছে হীরাপুরে আমাদের যে নতুন স্পেস্ গবেষণাগার বসেছে সেখান থেকে রওনা হব সেটাও প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।"

"তার মানে আসছে সপ্তাহেই তোরা দু'জন রওনা হচ্ছিস ? কিন্তু কাগজে যা পড়লাম. হ্যালি যখন পৃথিবীতে সবচেয়ে কাছে আসবে তার দূরত্ব থাকবে পৃথিবী থেকে ৬ কোটি কিলোমিটারের মত। এই অল্প সময়ের মধ্যেও ওখানে পৌঁছতে পারবি ?"

"এই দেখ্, কবি হলে বাইরের জগতের সম্বন্ধে কত অজ্ঞ হতে হয় তুই এর একটা জ্যান্ত নমুনা। আরে সে দিন কি আছে ? এখন মহাকাশযাত্রা কত সহজ হয়ে গেছে ! আগে কলকাতা থেকে দিল্লী-বোম্বাই যেতে যেটুকু সময় লাগত সে সময়ের মধ্যেই মানুষ চাঁদে গিয়ে নামছে। এর মধ্যে বার তিন-চার তো মঙ্গল গ্রহও ঘুরে এল ! আমি নিজেই তো গিয়েছিলাম একবার। আগে যেখানে রকেট পৌঁছতে লাগত পুরো এক বছর এখন সেখানে পৌঁছনো যায় মাত্র তিন সপ্তাহে। হ্যালি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যখন আসবে এই ক'দিনে তখন আমরা সটান তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারব।"

"বলিস কি ? ফিরতে পারবি তো আবার ?"

ভট্টশালী এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। ধূমকেতুর লেজ—যেটা নাকি কয়েক কোটি কিলোমিটারও লম্বা হতে পারে,—সে তো কতবার আমাদের পৃথিবীর গা ছুঁয়ে চলে গেছে ! অবশ্য তার মধ্যে খুব পাৎলা গ্যাস ছাড়া আর কিছু থাকে না। এত পাৎলা যে তেমন ঘন করে নিতে পারলে তা একটা এক লিটার দুধের বোতলের মধ্যেই পুরে নেওয়া যায়। কাজেই ও থেকে তো কোন ভয়ের কথাই ওঠে না। আসলে তো ওটা তৈরি হয় সূর্যের আলো আর তাপের চাপে ; যাকে বলে রেডিয়েশন প্রেসার, তাই থেকে। কাজেই সূর্য থেকে দূরে চলে গেলে ও লেজ আপনিই খসে পড়ে— অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

"ধূমকেতুর আসল বস্তু হচ্ছে ওর মাথাটা। ভেতরে খানিকটা শক্ত পদার্থই হবে—কিন্তু তার ব্যাস অতি সামান্য

বড় জোর হয় তো শ' খানেক কিলোমিটার কি ওর কাছাকাছি কিছু। ওকে আমরা বলি ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস। ওকে ঘিরে রেখেছে খুব ঘন গ্যাসের একটা আবরণ, সঙ্গে কিছু নিউক্লিয়াসের শুঁয়োও রয়েছে তার মধ্যে। সেটার ব্যাস কিন্তু তেমন ছোট নাও হতে পারে। ওরই নাম কোমা—গ্রীক ভাষায় যার নাম ঝাঁকড়া চুল।"

"ঐ থেকেই বোধ হয় ধূমকেতুর ও-দেশী নাম কোমেট?"

"বাঃ, ঠিক বলেছিস! কাব্য দেখে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো!"—কবি হলেও একটু-আধটু বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে দেখছি! কিন্তু যাক ও-সব বাজে কথা। হাতে আমার সময় বড় কম। 1986 সালের জানুয়ারীতে যে গিয়োত্তোর পাঠানো হয়েছিল তা ঐ কোমার মধ্যে ঢুকে পড়ে নানান্ খবর এনে দিয়েছিল, কিন্তু তার আরও ভেতরে নিউক্লিয়াসে পৌঁছতে পারে নি। আমরা এবার অভিযান করব একেবারে হ্যালির নিউক্লিয়াসে, এবং সশরীরে।

"ভাবছিস, ওখানে পৌঁছলে তো পুড়ে ছাই হয়ে যাব? না, যাব না। তার জন্য যা পোশাক-আশাক যা দরকার সবই আমাদের তৈরি। তা ছাড়া নিউক্লিয়াস যে অসম্ভব গরম হবে এরকম মনে করার কারণ নেই। কারণ ওর তো নিজের আলো নেই, সূর্যের আলোই ওর গায়ে ঠিকরে পড়ে ওকে অত উজ্জ্বল দেখায়। অবশ্য সূর্যের অদৃশ্য আলট্রাভায়োলেট বা ইনফ্রা রেড রশ্মি শুষে নিয়ে তা আবার দৃশ্য আলোতে রূপান্তরিত করবার শক্তি যদি ওর সত্যি সত্যি থাকে তবে অবশ্য ওর উজ্জ্বলতা আরও বাড়বে। উত্তাপও বাড়বে। কিন্তু ও সব কে কেয়ার করে না ভট্টশালী, কেয়ার করে না ভেঙ্কট সুব্বাও। একবিংশ শতাব্দীর অর্ধেকও পেরিয়ে এসে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে।"

কথা শেষ করে ভট্টশালী ঘড়িটার দিকে তাকালেন, শুচিস্মিতা ইঙ্গিতটা বুঝলেন, "আচ্ছা, আজ তবে আসি। আসছে সপ্তাহেই তা হলে পাড়ি দিচ্ছিস হ্যালিতে! শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলাম।

*   *   *   *

এর পরের খবর তো সংবাদপত্রেই বেরিয়েছিল ছবিটবি দিয়ে। ডক্টর ভট্টশালী ও তাঁর সহযাত্রী ডক্টর ভেঙ্কট সুব্বার এই সশরীরে হ্যালি অভিযান ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক অবাক্ করা তথ্য বয়ে নিয়ে এসেছে—বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে যার মূল্য অপরিসীম। ধূমকেতুর লেজের ঐ পাৎলা গ্যাসের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন সায়ানোজেন, কার্বন মোনোক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস। জলীয় বাষ্প তো ছিলই, এর কোন কোনটা ভীষণ বিষাক্ত—মানুষের পক্ষে, ভট্টশালীদের অভিযানে হ্যালির নিউক্লিয়াসে এই সব বিষাক্ত গ্যাস অনেক বেশি পরিমাণে ধরা পড়েছিল যদিও তাঁরা তো ওর জন্য "তৈরি হয়েই" গিয়েছিলেন। এর থেকে একটা নতুন সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীদের মনে এসেছে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি কেমন করে হ'ল সে রহস্য এতদিনেও সঠিক, প্রমাণিত হয় নি। এবার মনে হচ্ছে তা হবে। কারণ প্রাণ-সৃষ্টির জন্য যে বিরাট অনু তৈরি হওয়া দরকার তা হয়তো এই ধূমকেতু থেকেই প্রথম শুরু হয়। অবশ্য ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসে কোন জীবন্ত প্রাণীর খোঁজ তাঁরা পান নি।

কিন্তু পেয়েছেন আর একটা জিনিসের সন্ধান—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'ভাইরাস'। হ্যালির নিউক্লিয়াসে নাকি বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। ভাইরাস হচ্ছে জীব আর জড়ের মাঝামাঝি একটা পদার্থ। যখন জড় অবস্থায় থাকে তখন তারা একেবারেই নিষ্ক্রিয়—ক্রিস্টাল বা কেলাসের চেহারা নিয়ে থাকে। কিন্তু কোনও সজীব পদার্থের সংস্পর্শে এলেই ওরা হয়ে ওঠে জীবন্ত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করতে করতে ওরা অসংখ্য ভাইরাসে পরিবর্তিত হয়। আর ভাইরাস যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তা ডাক্তার আর রোগী সকলেই বহুদিন থেকে জানেন। যদিও এই ভাইরাস ব্যাক্টিরিয়ার তুলনায় আকারে অসম্ভব ছোট, কিন্তু বিজ্ঞানীরা যেদিন ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ তৈরি করতে শিখলেন সেদিন থেকেই ওদের চেহারা তাঁদের চোখে ধরা পড়ে গেল। অবশ্য সে সবই ক্রিষ্ট্যাল আকারের, আর এক-এক ভাইরাসের চেহারা এক এক রকম।

সে যাই হোক, ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল যে এই সব ধূমকেতুই সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ জেগেছে। সন্দেহ নয়, বিশ্বাসই বলব। তাই এ নিয়ে শুরু হয়েছে প্রচুর গবেষণা। ভট্টশালী ও সুব্বা হ্যালি থেকে ফিরে এসে এই সব ভাইরাসের প্রত্যক্ষ দর্শক হিসেবে যে সব তথ্য সরবরাহ করেছেন তার মূলাই বোধ হয় এবারকার হ্যালি অভিযানের একটা স্মরণীয় ঘটনা।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, ঐ সব ভাইরাস যদি ধূমকেতুতেই জন্ম নিয়ে থাকে তা হলে তারা এই এতটা পথ বেয়ে পৃথিবীতে নেমে এল কি করে?

সে রহস্য বার করবার জন্য কি আবার 75/76 বছর অর্থাৎ 2131-32 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? না, এখনই বিজ্ঞানীরা এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এবং মনে হয় তা করে ফেলবেনই।

হ্যালি-র বেচাল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দেখা গেছে ?

হ্যাঁ দেখা গেছে ! ঊনিশশ পঁচাশি বারোই নভেম্বর তারিখের খবর তাই ।

কি দেখা গেছে যা নিয়ে এত উত্তেজনা, তা নিশ্চয় এখন আর বলতে হবে না । কোথা থেকে কেমন দেখা গেছে সেইটেই আসল খবর ।

দেখা গেছে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস্ থেকে, দূরবীন টুরবিন নয় একেবারে খালি চোখেই । এইটিই যা বারোই নভেম্বর তারিখের খবর ।

লস এঞ্জেলস্-এর বাসিন্দাদের ঈর্ষা করবার কোনো কারণ কিন্তু নেই । আমেরিকার চিত্র-তারকাদের নিজস্ব মুলুক বলে ভাগ্য তাদের ওপর বেশি সুপ্রসন্ন এ কথা ভাবাও ভুল । যা দেখতে পাওয়া নিয়ে এত হৈ চৈ দুদিন বাদে সারা পৃথিবীর মানুষই প্রাণভরে তা দেখতে পাবে ।

কিন্তু এই দেখতে পাওয়াটাই এমন কিছু—কি বড় খবর ?

যা দেখবার কথা হচ্ছে তা যে হ্যালির ধূমকেতু তা আর নিশ্চয় হাঁক ডাক করে জানাতে হবে না । হ্যাঁ হ্যালির ধূমকেতু আসছে, আসছে যেমন তার নিয়ম, সেই ছিয়াত্তর বছর বাদে । সে আসবে তার লম্বা আগুনের লেজটা পেছনে ছড়িয়ে আমাদের সূর্যকে একটা পাক দিয়ে আবার ফিরে যাবে যেখান থেকে এসেছিল সেই অজানা সুদূর নিরুদ্দেশে ।

ব্যাপারটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন কিছু ত নয় । এক জীবনে কোনো একজন একবারের বেশি দুবার ও ঘটনা দেখবার সুযোগ পায় নি বললেই হয় । কিন্তু বিশেষ কোনো এক জন পেলেও পৃথিবীর মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এ ঘটনা যে দেখে লক্ষ্য করে আসছে । আরো অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের মহাভারতেও তার প্রমাণ আছে । যেমন তেমন প্রমাণ নয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটাই যে এই ধূমকেতুর অশুভ আবির্ভাবের ফল এমন ইঙ্গিতও নাকি দেওয়া আছে সেখানে ।

তাই স্বীকার করতেই হচ্ছে যে হ্যালির ধূমকেতুর আসা যাওয়া একটা অসাধারণ ঘটনা হলেও একেবারে নতুন অজানা কিছু নয় ।

হ্যালির ধূমকেতু আগেও যেমন এসেছে আর কিছু দিনের জন্যে রাতের আকাশের পরম বিস্ময় হয়ে থেকে সূর্যদেবকে

একবার পাক দিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, এবারও তাই যাবে।

কিন্তু ব্যাপারটা এবার শুধু তাই কি?

এই 1985-র 2রা জুলাই ফরাসী গায়নার কোস্ট থেকে গিয়োত্তো নামে যে রকেট ছোঁড়া হল সেটা কি নিছক বাহাদুরী! কি মতলবে জলের মত পয়সা খরচ করে ইওরোপিয়ান স্পেশ এজেন্সী বৃটিশ এরো স্পেস-এর সঙ্গে থেকে সত্তর কোটি কিলোমিটার পাড়ি দেবার এই রকেট ছোঁড়ার ব্যবস্থা করেছে!

হ্যাঁ, লক্ষ্য যে হ্যালির ধূমকেতু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু গিয়েত্তোকে ছোঁড়া হয়েছে যে দিক দিয়ে হ্যালি-র ধূমকেতু আসছে তার উল্টো দিক থেকে তার সঙ্গে মোলাকাৎ-এর জন্যে। আর সে মোলাকাৎ যদি সত্যিই হয় ত হবে সেই 1986-র 13ই মার্চ 'গ্রীনিচ' মানা ঘড়ির হিসাবে সন্ধ্যা 6টা 30 মিনিট থেকে পরের দিন 14ই মার্চ বেলা তিনটে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে। সে সাক্ষাৎ যদি হয় তাহলে 950 কিলোগ্রাম ওজনের তিন মিটার লম্বা গিয়োত্তো তার খবর যা পাঠাবে সে রেডিওবার্তা পৃথিবীতে পৌঁছোতে অন্তত আট মিনিট লাগবে।

কিন্তু খবর কি সত্যিই পাঠাতে পারবে গিয়োত্তো?

যদি পারেও তাহলে কেমন আর কি হবে সে খবর?

কি বলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধুরন্ধরেরা? কি বলেন আপনাদের টঙের ঘরের তিনি?

* * *

এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা পড়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে রণং দেহি চ্যালেঞ্জটা সেই মৌ-কা-সা-বি-স-এর।

কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের জবাব কেমন করে দেওয়া যাবে? টঙের ঘরের তাঁকেও আসরে নামান যাবে কি করে?

নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে কোনো রাস্তাই যখন ঠিক করতে পারছি না তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া দিয়েই আসরটা জমানো যায় কিনা সে চেষ্টার কথা ভাবা হল।

হ্যাঁ, সোজাসুজি ঝগড়া। হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে প্রায় হাতাহাতির অবস্থা পাকিয়ে তুলতে হবে।

ছিয়াত্তর বছর অন্তর দেখা দেওয়া ধূমকেতু এবার কি করবেন তাই নিয়ে যার যার নিজের কল্পনার লড়াই।

সুবিধে হয়ে গেল সকালের রেডিও মারফৎ খবরটা শোনায়। তারিখ 27শে নভেম্বর। হ্যালির ধূমকেতু আজই নাকি আমাদের দেশের আকাশে দেখা দিচ্ছেন। তবে খালি চোখে নয়, তাকে দেখতে হলে দূরবীন যোগাড় করতে হবে।

খবরটা 27শে সকালে পেলেও দূরবীনে দেখার মত হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাব নাকি হয়েছে 21শে নভেম্বর সূর্যাস্তের পর।

বিশ্বাস করি না—

সমস্ত আড্ডাঘর এক মুহূর্তে চমকে একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া এ কার গলা?

আর কারো নয় আমাদের শিবুরই।

গুরু নানকের জন্মদিন বলে ছুটি থাকায় সকালেই সবাই এসে আড্ডাতে জমায়েৎ হয়েছি। বনোয়ারী সুরভিত চায়ের ট্রে নিয়ে নিচে থেকে উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই টঙের ঘরের তিনিও এসে তাঁর মৌরসী আরাম কেদারা দখল করে শিশিরে মুখে সকালের বেতার সংবাদ শুনছেন এমন সময় শিবুর এই চমকে দেওয়া ঘোষণা।

নিজের ঘোষণাটা আরো জোরালো করবার জন্যে শিবু দ্বিতীয়বার সেটা গলা চড়িয়ে শোনালো—বিশ্বাস করি না আমি।

বিশ্বাস করো না? কি বিশ্বাস করো না? খানিক বিস্ময় বিমূঢ়তার পর আমাদের প্রশ্ন।

কি বিশ্বাস করি না?—শিবু নিজের বক্তব্যটা জোরালো করবার জন্যে প্রশ্নটা নিজেই আবার আউড়ে নিয়ে উত্তর দিলে —বিশ্বাস করি না তোমাদের ওই জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের হিসেব নিকেশ।

বিশ্বাস করো না—একেবারে হতভম্ব হয়েই বললাম,— কত যুগ যুগ ধরে যারা হিসেব মিলিয়ে আরো অনেক কিছুর জন্য এই ধূমকেতুর গতিবিধির নির্ভুল গণনা করে এসেছেন তাঁদের বিশ্বাস করো না? এতদিনে তাঁদের হিসেবের ভুল কোথাও ধরা পড়েছে?

ধরা পড়েনি বলেই ভুল যে হয় নি তার ঠিক কি শিবু হার না মেনে বললে,—আর আগে যদি ভুল নাও হয়ে থাকে এবারে হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

তোমার ধারণা—তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম— তোমার ধারণা মতে কি এবার হবে শুনি? হ্যালির ধূমকেতু এবার আসবে না?

আসবে না, বলছি না—শিবু জোর দিয়ে বলে চলল— এসেই যখন পড়েছে তখন আসবে না বলবে কোন আহাম্মুক, কিন্তু যেখান দিয়ে যেমন করে এসে যতদিন থাকবে বলা হচ্ছে সে সব হিসেব মিলবে না।

তার মানে—বিদ্রূপের সুরেই বললাম,—তা হলে হ্যালির ধূমকেতু আমাদের এই পৃথিবীর ওপরই আছড়ে পড়তে পারে!

তা পারে না এমন নয়।—শিবু আমাদের বিদ্রূপটা গ্রাহ্য না করেই যেন ধৈর্য ধরে বোঝালো, এর পরে কোনো বার হয়ত এসে পড়বে। তবে এবারে অমন একটা দুর্ঘটনা ধরতে না পারার মত হিসেবের ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবে ভুলচুক কিছু যে না হয়ে পারে না সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ার মত ব্যাপারে না হোক সে ভুল হ্যালির ধূমকেতুর এবারের গতিবিধিতেই ধরা পড়বেই।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আর কেন ? শিশির তর্কটা সিধে রাস্তায় চালাবার চেষ্টায় বললে– ধূমকেতু ত এসে পড়েছে তখন তার গতিবিধির বেয়াড়াপনা দেখতে পাব আর ক'দিনের মধ্যে। কিন্তু জ্যোতির্বিদদের গণনায় ভুল চুক যে হবেই এ ধারণার ভিতটা কি জানতে পারি ?

নিশ্চয় পারো।– শিবু তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বোঝালো — জ্যোতির্বিদেরা মূর্খ অথবা আনাড়ি গণক অবশ্যই নয়। তবু তাদের ভুল না হয়ে পারে না। আর সে ভুল হবার কারণ, যার কণামাত্র আমরা জেনেছি সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতল রহস্য। জ্যোতির্বিদেরা তাঁদের দূরবীন আর রেডিও-টেলিস্কোপ দিয়ে যেটুকু হদিস পান তা দিয়ে সে অসীম অতল রহস্যের কতটুকু অঙ্কের ছকে ফেলতে পারেন ? এ যেন পুকুরের জলের ঢেউ দেখে অপার সমুদ্রের রহস্যের ব্যাখ্যা করা।

না শিবু বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছে।

তার মানে তুমি বলতে চাও—বলে শিবুর দার্শনিকতা এবার থামাবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে থামল না, সমান উৎসাহে বলে চলল - এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের ছায়াপথের মত সামান্য একটা গ্যালাক্সি অর্থাৎ নক্ষত্র মণ্ডলের এক কোণের ছোট্ট একটা ধূমকেতু মাত্র ছিয়াত্তর বছর অন্তর আমাদের সূর্যের মত একটা ছোটখাটো তারাকে পাক দিয়ে যায়। সেই পাক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা আর সময়টা অনেককাল একরকম ছিল বলে কি চিরকাল থাকবে—না, থাকতে পারে ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে দিলাম আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সি-তেই কত কি না হচ্ছে যার ঢেউ এসে লেগে হ্যালির ধূমকেতুর গতিবিধি সব তছনছ করে দিতে পারে।

মানলাম যে তা পারে।—বিতণ্ডাটা যেন জমেছে বুঝে একটু উসকানি দিলে গৌর—কিন্তু মহাশূন্যে অমন ঢেউ তোলার মত তেমন কিছু ঘটেছে কি ?

ঘটেছে নিশ্চয়—শিবু জোর দিয়ে বললে,—আর যা ঘটে তার –, সব কি আমাদের জানা সম্ভব ? আমাদের পৃথিবীর সৌরমণ্ডল যে গ্যালাক্সির অর্থাৎ ছায়াপথে আমরা আছি, আমরা তার—কি দীনহীন একটা সদস্য তা জানো ? জানো আমাদের এই ছায়াপথের প্রায় কিনারার কেন্দ্র থেকে কতদূরে আমাদের সৌরমণ্ডল পড়ে আছে—তুমি জানো ?'

—শিবুকে খোঁচা দেবার ছল করে আড়চোখে যাঁর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম তাঁর কিন্তু কোনো সাড়াশব্দই নেই ! এক পেয়ালা শেষ করে টী-পট থেকে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে হাতে খবরের কাগজটাতেই যেন তন্ময় হয়ে আছেন। এমনি করে সাজিয়ে তোলা চালগুলো কি তাহলে ভেস্তেই গেল !

ওদিকে শিবু আবার তার নিজের ফাঁদেই না পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। ছায়াপথের কোন দূর কিনারায় আমাদের সৌরমণ্ডলের হেলায় ফেলায় পড়ে থাকার কি সব আঁক-জোকের কথা বলছিল তা শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে ত ?

তা পারল শিবু। বেশ একটু মাতব্বরী চালেই বললে,—আমাদের এই ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আমরা যত দূরে আছি তার সেকেণ্ডে যে আলোর গতি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেই আলোর সমান বেগে ছুটতে পারলেও আমাদের ত্রিশ হাজার বছর লেগে যাবে। এই দূরত্ব থেকে যে বিশালতার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তা আমরা জানব কি করে ? তোমরা বলবে যে সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি ছিয়াত্তর বছর পরে পরে কতবার ত হ্যালির ধূমকেতু ঘুরে গেছে। কম বেশী সেই পাঁচ হাজার বছরে তার গতিবিধির কোনো এদিক ওদিক হয়েছে কি ? হ্যাঁ মানছি যে সামান্য কিছু গতিবিধির অদল বদল যদি হয়েও থাকে তা ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু আমাদের কাছে অনেক মনে হলেও যে সময়টার অল্পবিস্তর সঠিক খবর আমরা পাচ্ছি তাই মাত্র পাঁচ হাজার বছর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড কারখানা পাঁচ হাজার বছর কি একটা হিসেবে ধরবার মত সময় ? আমাদের এই গোটা ছায়াপথ গ্যালাক্সি চরকির মত অনবরত পাক খাচ্ছে তা জানো বোধ হয়। একটা পাক পুরো করতে তার কত সময় লাগে ভাবতে পারো ? লাগে লাগে....এই আন্দাজ দশ....দশ....

শিবুর তোৎলামির মাঝখানে হঠাৎ আড্ডাঘরটা কাঁপিয়ে বাজখাঁই গলায় ধমক শোনা গেল—না। কুড়ি কোটি বছর !

হ্যাঁ বাবুদের পলতেটা ঠিকই ধরেছে শেষ পর্যন্ত। তাঁর ঘরের ছাদ কাঁপানো গলার ধমকটা আর কারো নয়, মৌরসী কেদারার সেই একমেবোদ্বিতীয়ম্ তাঁরই। তিনিই আগের শেষ করা পেয়ালাটা সামনের টী-পট-এ নামিয়ে রেখে বললেন—হ্যাঁ আমাদের ছায়াপথের একবার পুরোপুরি পাক খেতে লাগে পাক্কা কুড়ি কোটি বছর। আর আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সি-র বয়স হল বারো শ' থেকে দুহাজার কোটি বছর। হ্যালির ধূমকেতুর খবর যখন থেকে অল্প বিস্তর পেতে শুরু করেছি সেই পাঁচ হাজার বছর ওই অশেষ যুগযুগান্তের কাছে ত চোখের একটা পলকের বেশী নয়। সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত এ ধূমকেতুর অনেক চাল বেচাল হয়েছে ভাবলে তাই ভুল কিছু হবে না। তারপর মাত্র পাঁচ হাজার বছর সুশীল সুবোধ থেকে এবারই তার হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে কিছু বেচাল দেখানো তাই মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু বেচালটা তার কি ধরনের হতে পারে আর কেন, সেইটেই ভাববার !

ঘনাদা থামলেন। শিশিরও প্রস্তুত। ঘনাদার কথা শেষ হতে না হতেই তার নতুন সিগারেটের টিন খোলার মৃদু শিসের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর ঘনাদা তা থেকে সিগারেট তুলে মুখে ঠোঁটের ফাঁকে বসাতে না বসাতেই শিশিরের লাইটার জ্বালার মৃদু শব্দ যায় কানে।

সিগারেট ধরিয়ে ঘনাদা হাল্কা থেকে সুরু করে গোটা তিনেক রাম টান দিয়ে এক কুণ্ডলী ধোঁয়া না ছাড়া পর্যন্ত

ঘনাদার ধমক—কি রকম হতে পারে আর কেন তা নিজেরাই একটু ভেবে বল না

আমরা অধীর আগ্রহে খানিক চুপ করে থেকে ছেড়ে দেওয়া খেইটা একটু ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় দ্বিধাভরে বললাম—হ্যালির ধূমকেতুর বেচাল তাহলে এবার সত্যি হতে পারে? তা বেচালটা কিরকম?

কথা শেষ হতে না হতেই ঘনাদার ধমক—কিরকম হতে পারে আর কেন তা নিজেরাই একটু ভেবে বল না।

নিজেরাই ভেবে দেখব? চালের ভুলে শেষ কিস্তিটাই কাঁচিয়ে দিলাম নাকি? ঘনাদা কি চটেছেন নাকি?

না, গলাটা কড়া হলেও ঘনাদা বেশ তৃপ্তিভরেই সিগারেটে সুখটান দিলেন। দরকার এখন তাঁকে একটু তোয়াজ করা। তাই করলাম।

বোকা সেজে বললাম—বেচাল কি আর কেন হতে পারে বলব—বেচাল হলে আমাদের গ্যালাক্সির ওই যে বলেছেন বিশ হাজার আলোক বর্ষ দূরের কেন্দ্র সেখানে কোথাও কোনো সুপার-নোভা নক্ষত্রের বিস্ফোরণের দরুন আর তার ধাক্কায় হ্যালির ধূমকেতু এবার সূর্যকে পাক দেওয়ার বদলে হয় তার ভেতরে মরণ ঝাঁপ দেবে কিংবা কোনরকমে মান বাঁচিয়ে খসে যাওয়া লেজটা শুধু রেখে পালাবে।

লেজটা তোমার জন্যেই রেখে যাবে—আমার বাড়িয়ে দেওয়া চালটা শিশির উচিতমতই চড়াতে ভুল না করে বললে, সুপার নোভা অমন অনেক ফেটেছে আমাদের গ্যালাক্সিতে গত হাজার বছরে তার জন্য অবশ্য হ্যালির ধূমকেতুর কোনো বেচাল আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে জানি না। না ঘনাদা আপনি বলুন কি বেচাল দেখব এবার হ্যালির ধূমকেতুর—

কি বেচাল দেখব তা কেউই ঠিক করে বলতে পারে না, তবে ·

ঘনাদা যেন সুদূর মহাশূন্যেই নিজেকে চালান করে দিয়ে বললেন, তবে হয়ত হতে পারে এমন সবকিছু ব্যাপার অনুমান

করতে পারি। তার যা এবার হতে পারে বা হতে যাচ্ছে আমাদের নিজেদেরই কর্মফল। হ্যাঁ ফ্রেঞ্চ গায়নার কোস্ট থেকে ছোঁড়া গিয়োত্তো হয়ত তাকে যা হুকুম তার চেয়ে আলাদা বেশী কিছু করবে। হয়ত তার গণকযন্ত্র ভুল করে বসবে আর সেই ভুলের দরুন হ্যালির ধূমকেতু থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তার খবর নেবার বদলে সে ধূমকেতুর মাথায় ঝাঁপিয়ে ঢুঁ মেরে বসবে আর তাতে যা হবে সেইটেই আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার। গিয়োত্তোর গুতোয় ধূমকেতুর মাথা কিংবা লেজ থেকে যা বেরিয়ে আস্‌বে সেইটেই সাত রাজার ধন মাণিকের চেয়ে অবাক করা এক বস্তু। পৃথিবী থেকে লক্ষ্য রাখা দূরবীনে সে বস্তুর দেখা পাওয়া মাত্র পৃথিবীর দুই মহাশক্তির কেউ হয় ফেরি-রকেট চ্যালেঞ্জারে নয় অন্য কোনো মহাকাশযানে তাকে উদ্ধার করে আনবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্ধার করার পর সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়ের আর সীমা থাকবে না জিনিসটা কি তা বুঝতে পারার পর। জিনিসটা একটা অসাধারণ টি ভি ক্যামেরা যা হ্যালির ধূমকেতুর ভেতরে গাঁথা হয়ে থেকে আগাগোড়া তার ছিয়াত্তর বছরের মহাকাশ পরিক্রমার সব বিবরণ ধরে রেখেছে। পৃথিবীর মানুষেরা এরকম একটা যন্ত্র হ্যালির ধূমকেতুর ভেতরে গেঁথে তার ছিয়াত্তর বছরের পাড়ির সব বৃত্তান্ত ধরে রেখে সংগ্রহ করার কথা ভাবছিল। সে চেষ্টা তাদের আর করতে হল না।

এটা যে কল্পনাতীত আশাতীত সৌভাগ্য সে কথা আর বলবার নয়, কিন্তু কথা যা হবে তা এই যে এমন আশ্চর্য যন্ত্র কারা তৈরী করে হ্যালির ধূমকেতুর মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। ছিয়াত্তর বছর আগে দূরদর্শন ক্যামেরা কি রকেট বিজ্ঞান ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষেরও হাতেখড়ি মাত্র হয়েছে বলা যায়। এমন আশ্চর্য কীর্তি তাহলে কার?

সৌরমণ্ডলের কোনো গ্রহে উন্নত সভ্যতা দূরে থাক বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে তার ছিয়াত্তর বছরের পরিক্রমায় হ্যালির ধূমকেতু আরো অনেক দূর পর্যন্ত টহল দিয়ে আসে বটে কিন্তু তাও ত চারদশমিক তিন আলোকবর্ষ দূরের আমাদের সবচেয়ে কাছের তারকা প্রক্সিমা সেনটোরির চেয়ে দূরে নয়। এরকম একটা যন্ত্র বানিয়ে তা হ্যালির ধূমকেতুতে গেঁথে দেওয়ার ক্ষমতা যাদের হয়েছে এমন উন্নত সভ্যতায় পৌঁছোনো প্রাণী তাহলে আছে কোথায়? আমাদের কোনো দূরবীনে তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি কেন এতদিন, এইটেই হবে আমাদের ভাবনা। তবে এ প্রশ্নের উত্তরও আছে।

পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারা পর্যন্ত ফাঁকা মহাশূন্যে খানিকটা কালা নীহারিকার এলাকা যে আছে তাও আমরা দেখেছি। মহাকাশের মুলুকে অন্ধকার কত কি যে লুকিয়ে রাখে কে জানে, মানুষেরও আগে দূরদর্শন বা রকেট-যন্ত্র আবিষ্কারের মত উন্নত সভ্য প্রাণীর হয়ত সেখানে কোথাও বাস। তাদের দূরদর্শন যন্ত্র থেকেও তাদের বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করতে পারি।

এখন শুধু তারই অপেক্ষায় থাকা—শিশিরের সিগারেটের টিনটা অন্যমনস্কভাবে পকেটে নিয়ে টঙের ঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন - ১৯৮৬-র ১৩ই মার্চ ত আর খুব বেশী দূরে নয়।

কার্টুন ঃ রেবতীভূষণ

কমপিউটারের চোখে হ্যালির ধূমকেতু

সাদাকালো ছবি থেকে ধূমকেতুর ভেতরের গঠন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারা যায় না। সেজন্য মূল ছবির নেগেটিভকে কম্পিউটারের সাহায্যে বিশেষভাবে প্রসেস করে তা থেকে ভিডিও স্ক্রীনে রঙীন ছবি তৈরীর উপায় বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। হ্যালীর ধূমকেতুর এই ছবিটিতে তার ভেতরের গঠন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

1910 সালে যখন হ্যালির ধূমকেতুকে দেখা গিয়েছিল তখনও রঙীন ফটোগ্রাফি চালু হয় নি। কেবলমাত্র সাদা-কালো ছবি তোলা হতো। সুতরাং সে সময় হ্যালির ধূমকেতুর যত ছবি তোলা হয়েছিল সে সবই ছিল সাদা-কালো ছবি। তা' হলে এ ছবিটি রঙীন হলো কি করে?

আধুনিক কমপিউটারের দৌলতে।

সর্বাধুনিক মহাকাশযান
ভেগা ১ ও ভেগা ২

ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিসজ্জিত মহাকাশ পাঠাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন রুশ বিজ্ঞানীগণ। এই প্রকল্পের নাম ভেগা। এই মহাকাশযান মহাকাশে পর্যবেক্ষণ চালাবে দুভাবে। প্রথমে শুক্রগ্রহের পরে হ্যালীর ধূমকেতুর। ভেগা ১ ও ভেগা ২-কে মহাকাশে ছাড়া হয় 1984 সালের 15ই ও 21শে ডিসেম্বর। শুক্রগ্রহের ছবি ও অন্যান্য তথ্য পাঠাবার পর মূল মহাকাশ যান দুটি এখন ধীরে ধীরে হ্যালীর ধূমকেতুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 6ই মার্চ তারা এসে পেঁছিবে হ্যালীর মুখোমুখি। তারপর শুরু করবে তথ্য অনুসন্ধান।

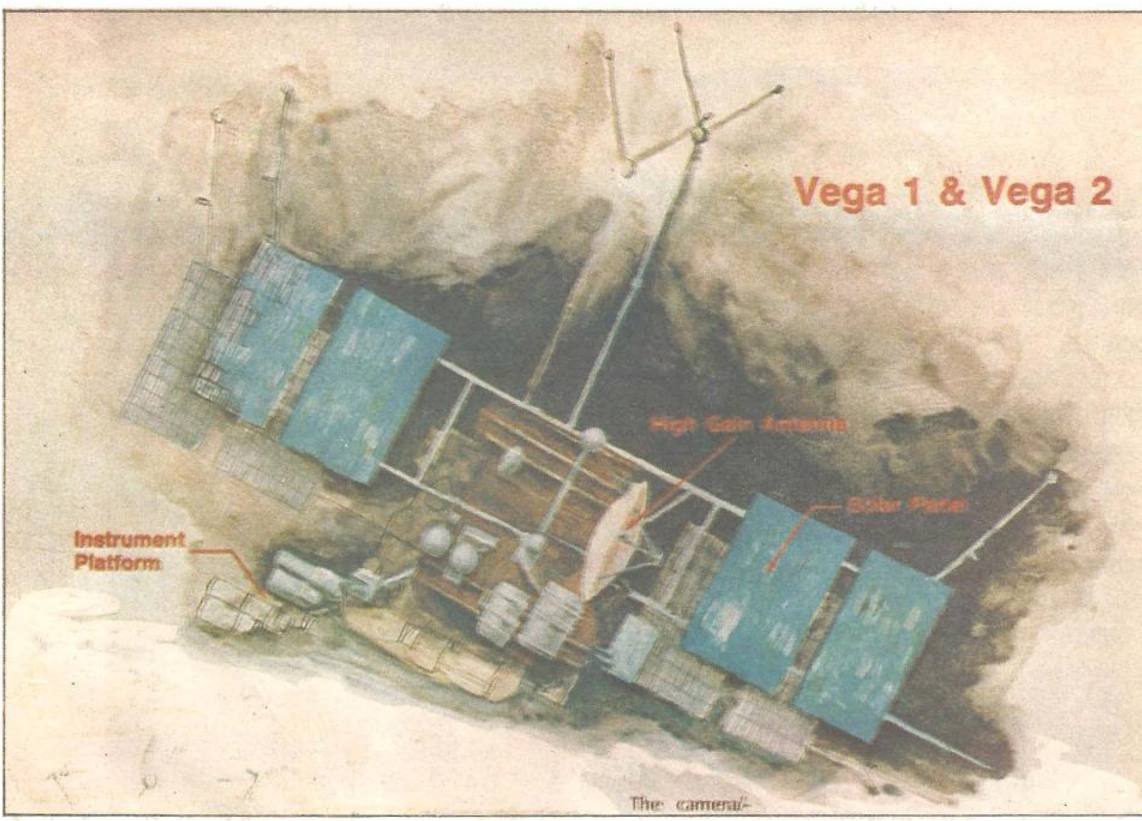

স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান জিয়োটো

গত 3রা জুলাই 1985 European Space Agency একটা মহাকাশ পাঠিয়েছেন—মহাকাশ যানটির নাম রাখা হয়েছে 'প্রজেক্ট জিয়োটো' (Project Giotto)। কিন্তু এর নাম জিয়োটো রাখা হল কেন ?

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীতে জিয়োটো ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিত্রকর। সেই সময়ে হ্যালীর ধূমকেতুর আবির্ভাবকে তিনি অমর করে রেখে গেছেন—তার আঁকা ছবিতে। শিল্পীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যেই প্রকল্পটির নাম রাখা হয়েছে 'প্রজেক্ট জিয়োটো'। পরিকল্পনাটি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানটি ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে মাত্র 480 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আগামী 13ই মার্চ '86 তার নিরীক্ষণ কার্য চালাতে সক্ষম হবে।

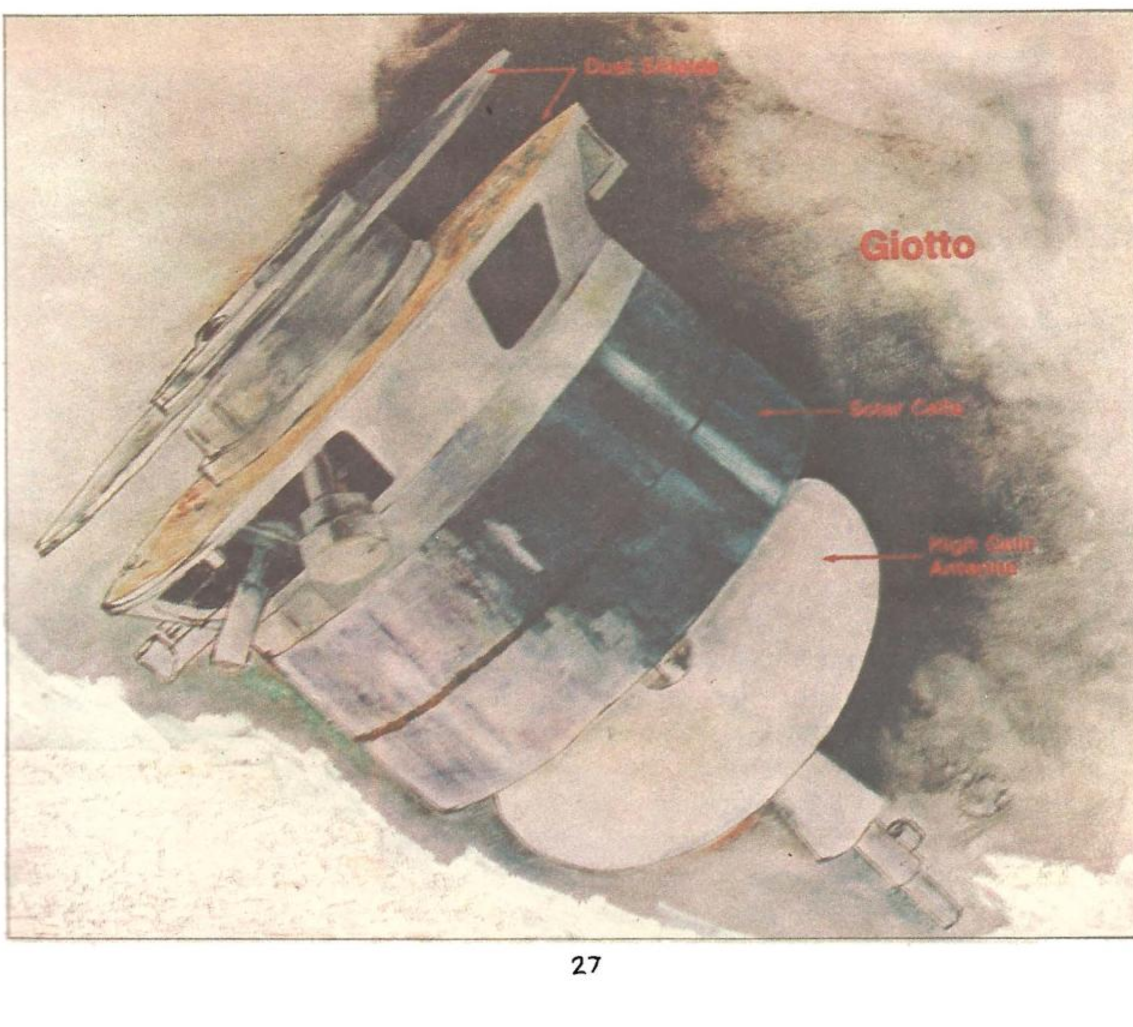

হ্যালি পর্যবেক্ষণ

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল মাঝে মাঝেই সংবাদপত্রে তোমরা হ্যালির ধূমকেতুর সংবাদ দেখতে পাও, যেমন আগস্ট মাসে দেখেছ যে জাপানের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দূরবীনে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখা গেছে। মাঝে মাঝে রেডিও বা দূরদর্শনের মাধ্যমেও হ্যালির ধূমকেতু সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পাচ্ছ। তাই তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগে, হ্যালির ধূমকেতুকে নিয়ে এত মাতামাতির কারণ কি? হ্যালির ধূমকেতু আবার আসছে, এমন একটা সংবাদ সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছে কেন? এ ব্যাপারে তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহদের কেমন করে উৎপত্তি হ'ল, সে সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা আজও বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। ধূমকেতুরা সৌরপরিবারের স্থায়ী অধিবাসী, কিন্তু তাদের সম্পর্কেও অনেক প্রশ্নের সমাধান আজ পর্যন্ত মেলেনি। ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশে সত্যি সত্যি কি আছে, এরকম সব প্রশ্নের সমাধান করতে পারলে বিজ্ঞানীদের ধারণা যে সৌরজগতের উৎপত্তির একটা হদিস মিলতে পারে। তা ছাড়া বর্তমানে বিজ্ঞানীদের দখলে আছে অতি আধুনিক সব সাজ-সরঞ্জাম যেমন প্রচণ্ড শক্তিশালী দূরবীন শক্তিশালী রেডিও দূরবীন মহাকাশযান প্রভৃতি। এইসব যন্ত্রপাতি সদ্ব্যবহার করে এবারের আবির্ভাবে হ্যালির ধূমকেতুর খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে আবার 76টি বছর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। যদি আরও অনেক ধূমকেতু নিয়মিতভাবে পৃথিবীর নিকট দিয়ে চলে যায়, তবুও সমস্ত দিক বিচার করলে হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই চলে না—ধূমকেতু রহস্যের কিনারা করতে হলে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে বেছে নেবেন হ্যালির ধূমকেতুকে। তাই 1986 সালের হ্যালির আবির্ভাবের সঙ্গে একটা মস্ত বড় সুযোগ বিজ্ঞানীদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর যত মানমন্দির রয়েছে, সেগুলিতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে—প্রস্তুতি চলেছে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্যে। এই পর্যবেক্ষণকে প্রধানতঃ দুভাবে ভাগ করা যেতে পারে—(১) পৃথিবীর বুকে নানান জায়গায় বসান দূরবীন, রেডিও দূরবীন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ এবং (২) মহাকাশযান পাঠিয়ে একেবারে হ্যালির খুব কাছ থেকে নানান উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ।

হ্যালির ধূমকেতুকে যেভাবেই পর্যবেক্ষণ করা হোক্ না কেন, সেই সমস্ত পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য সমন্বয়ের জন্যে গঠিত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্টারন্যাশনাল হ্যালি ওয়াচ' (International Halley Watch)। এই সংস্থার মূল কেন্দ্র করা হয়েছে দু' জায়গায়—একটি হল মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রপালসন লেবরেটরী, আর একটি হল পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত নুরেমবার্গের এর ল্যাংগেন বিশ্ববিদ্যালয়। হ্যালির ধূমকেতু সম্পর্কে যেসব মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হবে, এই সংস্থা এইসব তথ্য পুস্তক আকারে প্রকাশ করবেন, যা এর পরের একবিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবের সময়ে হ্যালির ধূমকেতুর পর্যবেক্ষকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে।

এবারে হ্যালির ধূমকেতুর আগমনের সময় পৃথিবী থেকে স্বয়ংক্রীয় মহাকাশযান পাঠিয়ে তাকে অভ্যর্থনার কেমন অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলব। এর আগে তোমাদের বলি যে এই বিশাল অর্থব্যয় করে মহাকাশযান পাঠাবার প্রয়োজনটা কোথায়? ধূমকেতুর একেবারে কেন্দ্রীয় অংশ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে nucleus অত্যন্ত ক্ষুদ্র—এর ব্যাস 16 কিলোমিটারেরও কম হয়ে থাকে। যেখানে আমাদের পৃথিবীর ব্যাস হল 12735 কিলোমিটারের মত। এত ক্ষুদ্র বলে, অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশকে পর্যবেক্ষণ করে তার গঠন ও উপাদান সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মহাকাশযান পাঠিয়ে মহাকাশের বাসিন্দাদের সম্পর্কে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তাই 1986 সালে হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাগমন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এক অপূর্ব সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পরিকল্পনাও অনেক আগে থেকে রূপায়িত হয়েছে।

এখন পর্যন্ত চারটি মহাকাশযান উৎক্ষিপ্ত করার পরিকল্পনা এই ব্যাপারে আছে। এর মধ্যে একটি হল জাপান থেকে—এর নাম দেওয়া হয়েছে "প্ল্যানেট এ" (Planet A)। এটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এই বছরের 14ই আগস্ট। তোমরা বোধ হয় জান যে হ্যালির ধূমকেতুর সূর্যের সবচেয়ে কাছে অর্থাৎ অনুসূর অবস্থানে (Perihelion) আসার কথা 1986 সালের 9ই ফেব্রুয়ারী। "প্ল্যানেট এ" হ্যালির সবচেয়ে কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে আগামী বছরের 8ই মার্চ। এই প্রকল্পটিই হবে গবেষণার জন্যে মহাকাশযান পাঠানোর ব্যাপারে জাপানের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। এছাড়া ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (European Space Agency) গত 3রা জুলাই একটি মহাকাশযান পাঠিয়েছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে "প্রোজেক্ট জিয়োটো" (Project Giotto)। তোমাদের মনে আসতে পারে যে এর নাম জিয়োটো রাখা হল কেন? জিয়োটো ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালির খ্যাতনামা চিত্রকর—সেই শতাব্দীতে যখন হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল, সেই আবির্ভাবকে তিনি অমর করে গেছেন তাঁর আঁকা একটি পটের মাধ্যমে। তাই এই অমর চিত্রশিল্পীর সম্মানার্থে এই প্রকল্পের নাম রাখা হয়েছে জিয়োটো। এই পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে করে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানটি একেবারে হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে মাত্র 480 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আগামী 13ই মার্চ চার ঘণ্টা ধরে তার নিরীক্ষণ কার্য চালাতে সমর্থ হবে—এ এক অভিনব পরিকল্পনা।

তবে সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত মহাকাশযান পাঠাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে "ভেগা" (Vega)। এই মহাকাশযান দু'রকমের পর্যবেক্ষণ কাজ চালাবে—প্রথমে শুক্রগ্রহের এবং পরে হ্যালির ধূমকেতুর। রাশিয়ান্ ভাষায় শুক্র গ্রহকে বলা হয় ভেনেরা (Venera), আর "হ্যালি" নামটা উচ্চারিত হয় "গ্যালি" হিসেবে। ভেনেরা-র আদ্যক্ষর, আর গ্যালির আদ্যক্ষর নিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে "ভেগা", ভেগা প্রকল্পে আছে দু'টি পৃথক মহাকাশযান "ভেগ্যা—1" ও "ভেগা—2"—এদের উৎক্ষেপণ কার্য সমাধা হয়েছে যথাক্রমে 1984 সালের 15ই ও 21শে ডিসেম্বর। এই দুটিকেই শুক্র গ্রহ ও হ্যালির ধূমকেতু উভয়েরই খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহের কাজে লাগান হয়েছে। 175 দিন পরে শুক্র গ্রহের অন্ধকার দিক পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় গত জুন মাসে এই দুটি মহাকাশযান থেকেই যন্ত্রপাতি সমেত দুটি আধার (module) শুক্র গ্রহের উপরিতলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে—এই আধার দুটি শুক্র গ্রহের তলের ওপর ধীরে ধীরে অবতরণ করে শুক্রের তলের নানারকম আলোক চিত্র ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠিয়েছে। আর মূল মহাকাশযান দুটি এখন শুক্রগ্রহকে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে হ্যালির ধূমকেতুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে—ভেগা—1 আগামী 6ই মার্চ একেবারে হ্যালির মুখোমুখি এসে উপস্থিত হবে, আর তিনদিন পরেই ভেগা—2 গিয়ে পৌঁছবে। এই দুটি মহাকাশযানে যে সব সর্বাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম আছে সেগুলোর পরিকল্পনা মিলিতভাবে সোভিয়েত, ফরাসি ও হাঙ্গেরিয় বিজ্ঞানীরা করেছেন। দুটি মহাকাশযানেই হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের 9600 কিলোমিটার দূর থেকে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করবে। এই সবকটি মহাকাশযানেই যেসব যন্ত্রপাতি থাকবে, তার দ্বারা ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের আলোকচিত্র নেওয়া, এই কেন্দ্রীয় অংশ যেসব গ্যাসীয় উপাদানে গঠিত তাদের রাসায়নিক বিচার এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপন সম্ভবপর হবে। এর মানেই হল ধূমকেতু সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যেসব তথ্যের কোনরকম সঠিক ধারণা নেই, সেইসব

তথ্য জানা সম্ভবপর হয়ে উঠবে, এইসব মহাকাশযান একেবারে হ্যালির ধূমকেতুর খুব কাছাকাছি পাঠিয়ে।

তোমাদের এখন নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে, ভারতে হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে পর্যবেক্ষণের কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে ভারতও পিছিয়ে নেই। ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান্ হ্যালি অবসারভেশন প্রোগ্রাম (Indian Halley Observation Programme), সংক্ষেপে এর নাম দেওয়া হয়েছে IHOP। এর মূল কেন্দ্র হল বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এই কর্মসূচি রূপায়ণে প্রধানত 6টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করছেন—এরা হল বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, নৈনিতালের মানমন্দির, রঙ্গাপুরের মানমন্দির, বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, (সংক্ষেপে

সেটা হল খুব বড় একটা হাইড্রোজেন ভরা বেলুন আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হবে, আর এই বেলুনের সঙ্গে বাঁধা থাকবে বিশেষ ধরনের দূরবীন যেটা মাটি থেকে 40 কিলোমিটার ওপরে উঠে হ্যালির ধূমকেতুকে অবলোহিত আলোতে পর্যবেক্ষণ করবে।

কলকাতা শহরের আলো, ধোঁয়া ও ধুলো, এগুলো সবই দূরবীনের সাহায্যে ধূমকেতুর আলোকচিত্র গ্রহণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচণ্ড অন্তরায়। সেইজন্যে কলকাতার পজিসন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টার তাদের দুটি প্রতিফলক দূরবীন, একটি 11—ইঞ্চি ও অপরটি 14—ইঞ্চি, কলকাতার প্রায় 100 কিলোমিটার দূরে খড়গপুরের কাছে একটা গ্রামে বসাবার ব্যবস্থা করেছেন। এই গ্রামেই একটা অস্থায়ী শিবির করে, এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা আগামী নভেম্বর মাস থেকে 1986 সালের এপ্রিল পর্যন্ত তাঁদের হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাবেন।

ইতিহাসে হ্যালির ধূমকেতু

1066 খ্রীস্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাবের কয়েক মাসের মধ্যেই নর্ম্যানৃডির ডিউক উইলিয়াম হেস্টিংসের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের রাজা হ্যারল্ডকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে হ্যারল্ডের মৃত্যু হয়। ঐ সময় কাপড়ে বোনা নক্সায় মৃত্যুর আগে সিংহাসনে রাজা হ্যারল্ড ও আকাশে হ্যালির ধূমকেতুর ছবি। ছবিতে বাঁদিকে ধূমকেতুর আবির্ভাবে আতঙ্কিত নগরবাসীকে দেখানো হয়েছে।

TIFR) আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী আর কলকাতার পজিসন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টার। তামিলনাড়ুর কাভালুরে অবস্থিত 40—ইঞ্চি প্রতিফলক দূরবীন, নৈনিতালের 40—ইঞ্চি দূরবীন, আর রঙ্গাপুরের 48 ইঞ্চি দূরবীন—এই তিনটি শক্তিশালী দূরবীনই ভারতে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের বিজ্ঞানীরা এই তিনটি দূরবীনের সাহায্য নেবেন তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজের জন্যে। তবে TIFR-য়ের বিজ্ঞানীরা একটা নতুন পরিকল্পনা করেছেন।

আগেই তোমাদের বলেছি যে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ভেগা মহাকাশযান দুটি পাঠিয়েছেন—এই দুটিই হ্যালির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 48 ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে হ্যালির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে, সেই তথ্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের নিয়মিত সরবরাহ করার ব্যবস্থা ভারতে করা হয়েছে।

তাই সারা পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অধীর আগ্রহে দিন গুণছেন এবারকার হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ থেকে ধূমকেতুর উৎপত্তি এবং তার জীবনরহস্য সম্পর্কে নতুন তথ্য জানার জন্যে।

হ্যালির ধূমকেতু, যুগে যুগে

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

স্কুলে পড়তে বিজ্ঞানের ক্লাসে গল্প শুনতাম যে আমাদের জন্মের বহু আগে আকাশে এক বিরাট ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। যার ভয়ে লোকের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আরও শুনতাম যে সেই ধূমকেতু আবার ফিরে আসবে 1985 খ্রীস্টাব্দে। চল্লিশের সেই সবদিনে আমরা কলকাতার লোক জাপানী বোমার আশঙ্কায় দিনরাত কাটাতাম। 1985 সাল কোনও দিন আসবে কিনা আর সেই ধূমকেতু দেখবার জন্য বেঁচে থাকব কিনা এরকম সন্দেহও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারত।

সেই বয়সে ধূমকেতু জিনিসটা কি সেটা দেখবার সুযোগ হয় নি, কিন্তু তার জন্য বেশিদিন অপেক্ষাও করতে হয়নি। 1947 সালের পূজোর পরেই আকাশে দেখা গিয়েছিল একটি ধূমকেতু। আমাদের ভবানীপুরের বাড়ির পুবের বারান্দা থেকে সেই জ্যোতিষ্কটিকে পরিষ্কার খালি চোখে দেখতে পেয়েছিলাম। দেখতে ভাল লাগলেও খানিকটা হতাশ হয়েছিলাম। এতো ছোট একটা তারার মতই। সেই দিগন্ত ব্যাপী পুচ্ছের কোনও চিহ্ন ছিল না। বড়রা বলেছিলেন, দাঁড়াও, আবার হ্যালির ধূমকেতু আসুক তখন দেখবে।

সেই হ্যালির ধূমকেতু আবার এসেছে। এখনও সূর্যের খুব কাছে আসতে মাস ছয়েক দেরী আছে। তবুও কাভালুরের বড় টেলিস্কোপে এখন থেকেই নিয়মিত দেখা যাচ্ছে। চেহারায় ধূমকেতু সুলভ বৈশিষ্ট্য এখনও ধরা পড়েনি। শুধু আবছা একটা ক্ষীণ তারার মতই দেখায়; তবে এর গতি বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়, লক্ষ্য করা যায় যে পিছনের তারামণ্ডলীর সামনে দিয়ে এটি প্রায় প্রতি ঘণ্টায় বারো সেকেণ্ড এগিয়ে চলেছে। ছবি তুলতে গেলে টেলিস্কোপের গতি সামান্য বদলাতে হয়; আধ ঘণ্টাটাক এক্সপোজার দিয়ে ছবি তুললে এখন হ্যালির ধূমকেতুটিকে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট বিন্দুর মত। আর পিছনের তারাগুলি এক একটি ছোট্ট ক্ষীণ রেখার মত দাগ কাটছে।

ধূমকেতুটির ঔজ্জ্বল্য অবশ্য দিন দিনই বাড়ছে। নভেম্বরের শেষেই একটা ছোট টেলিস্কোপ বা ভাল বাইনোকুলার দিয়ে দেখার মত উজ্জ্বল হবে। আগামী বৎসরের গোড়ায় এটিকে খালি চোখে দেখতে পাবার মত উজ্জ্বল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তারপরে আরও উজ্জ্বল ও বড় দেখাবে; মার্চ মাসের শেষে এর বড় পুচ্ছ সমেত চেহারাটি পরিষ্কার খালি চোখে দেখা যাবে বলে অনুমান করা হয়।

আকাশে নানারকমের জ্যোতিষ্ক দেখা যায়; গ্রহ, তারা নীহারিকা, সকলেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু ধূমকেতুগুলি এদের থেকে সব দিক দিয়েই আলাদা। এদের আপাত বিস্তার অনেক বড়। আমাদের চেনা জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে চাঁদ আর সূর্যকে সবচেয়ে বড় লাগে এদের দুটিরই মাপ হল প্রায় আধ ডিগ্রী। উত্তর আকাশে অ্যানড্রোমিডা নীহারিকার বিস্তার প্রায় দেড় ডিগ্রী। কিন্তু বেশ ক্ষীণ; সে তুলনায় পুচ্ছ সমেত ধূমকেতুর মাপ অনেক বড় হয়। এবারের হ্যালির ধূমকেতু খুব একটা সুবিধামত অবস্থানে আসছে না; তবু এর পুচ্ছের মাপ হবে বিশ ডিগ্রীর মত। 1910 সালে এটির বিস্তার হয়েছিল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

এগুলির ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তনও বেশ অনেকখানি। আমাদের চেনা জ্যোতিষ্কগুলির ঔজ্জ্বল্যের নিয়মিত পরিবর্তন এত বেশি হয়। অবশ্য চাঁদ ছাড়া। পরিবর্তনশীল তারাগুলির ঔজ্জ্বল্যের কমাবাড়া সাধারণতঃ দশ বিশগুণের মধ্যেই

হ্যালির ধূমকেতু 1910। কোদাই কানাল ফটোগ্রাফ

সীমাবদ্ধ, কয়েকটি বিশেষ ধরনের তারার ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন কয়েক লক্ষগুণ হতে পারে। সেই তুলনায় আন্তর্জাতিক হ্যালি নিরীক্ষণ সংস্থাটির (International Halley Watch) হিসাবে দেখা যায় কয়েক মাসের মধ্যেই ধূমকেতুটির প্রায় হাজারগুণ উজ্জ্বল হয়েছে এবং আরও হাজারগুণ বাড়বে খুব কম সময়ের মধ্যেই।

ধূমকেতুগুলির আপাতগতিও বেশ দ্রুত। গ্রহগুলির চলাফেরা, যা প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌রা খালি চোখেই মাপতে পারতেন, সে হিসাবে অনেক শ্লথ। সবচেয়ে দ্রুত অবশ্য আমাদের চাঁদের গতি, প্রায় দু'ঘণ্টায় এক ডিগ্রী। কিন্তু অন্যান্য গ্রহগুলি দিনে এক ডিগ্রীরও কম পথ অতিক্রম করে। ধূমকেতুগুলি যখন পৃথিবীর কাছাকাছি আসে তখন দিনে পাঁচ-ছয় ডিগ্রীর মত গতি কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে ধূমকেতুগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য প্রমাণিত হয়। ধূমকেতুগুলি যখন বড় আর উজ্জ্বল দেখায়, তখন এগুলি বেশ কাছে এসে পড়ে, এবং এর গঠনের উপাদান হচ্ছে সহজে উদ্‌বায়ী (Volatile) কোনও পদার্থের সমষ্টির। এ দুটির অন্য প্রমাণও পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক মাপ থেকে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে একই সঙ্গে এদের অবস্থান মাপলে সামান্য প্রভেদ দেখা যায়, যা শুধু কাছের জ্যোতিষ্কের পক্ষেই সম্ভব। আর ধূমকেতুর আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় মিথেন (Methane) অ্যামোনিয়া (Ammonia) আর জলের বরফের সংকেত।

ধূমকেতুর আসল বস্তুটির মাপ বেশ ছোট, কয়েক কিলোমিটার ব্যাসের ধূলিমাখা বরফের এক একটি পিণ্ড। মহাশূন্যের হিমশীতল পরিবেশে থাকে জমাট শক্ত হয়ে; তখন এর থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলোতে এগুলিকে অতি ক্ষীণরূপে দেখা যায়। কিন্তু যত সূর্যের কাছে আসে, সৌর বিকিরণে তপ্ত হয়ে এর থেকে নির্গত বাষ্প ও ধূলিকণার এক বড় মেঘের সৃষ্টি করে; এইটাই হয় ধূমকেতুর শীর্ষ। তারপর আরও কাছে এলে সৌর বিকিরণের চাপ ও কণিকাস্রোতে এই মেঘের কিছুটা আরও ছড়িয়ে পড়ে পুচ্ছের সৃষ্টি করে। সেই সময় যদি পৃথিবীও কাছাকাছি থাকে, তখন দিগন্ত জোড়া রূপ চোখে পড়ে, যেমন হয়েছিল 1910 সালে হ্যালির ধূমকেতুর বেলায়। তারপরে সূর্যকে পরিক্রমা করে ধূমকেতুগুলিকে আবার দূরে সরে যেতে হয়, তখন এর ঔজ্জ্বল্য আর পুচ্ছের দৈর্ঘ্য দুইই কমতে থাকে, তারপর একদিন এত ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে আকাশে অসংখ্য তারার মাঝখানে আর এটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই অতীতে প্রতিবার যখনই কোন ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছে, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌রা মনে করতেন, যে নতুন কোনও জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি যে বারবার ফিরে আসতে পারে সে সম্ভাবনা সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালির (Edmond Halley) আগে কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি।

আজকাল ধূমকেতুর নামকরণ হয় আবিষ্কারকদের নামে, যেমন ইকীয়া-সেকি (Ikeya-Seki) বেনেট (Bennett) বা ওয়েস্ট (West), যাঁরা জ্যোতিষ্কগুলিকে প্রথম লক্ষ্য করে সেগুলির গতিপথ নির্ণয় করেন। কিন্তু হ্যালি তাঁর নামে অভিহিত ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন নি; তিনি তার চেয়ে বড় উজ্জ্বল কাজ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে 1682 খ্রীস্টাব্দের উজ্জ্বল ধূমকেতুটি বার বার ফিরে এসেছে। তার আগে লোকের ধারণা ছিল যে ধূমকেতুগুলির আবির্ভাবের কোনও হিসাব করা যায় না। এগুলিকে ঈশ্বরের রোষ দৃষ্টি বলে ধরা হ'ত, এবং যখন পৃথিবীতে কোনও বিরাট পরিবর্তন হয়, তখনই ধূমকেতু দেখা যায় এইরকম ধারণা ছিল। হ্যালি প্রমাণ করেছিলেন যে ধূমকেতুগুলি গ্রহ-উপগ্রহের মত জড় পদার্থ বিশেষ, প্রকৃতির নিয়মেই মাঝে মাঝে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়ে।

1682 খ্রীস্টাব্দে আকাশে যখন একটি ধূমকেতু দেখা গেল। তখন কারুর মনে হয় নি যে এটি একটি পুরানো ধূমকেতু আবার ফিরে এসেছে। তখন টেলিস্কোপের ব্যবহার শুরু হয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার কাজে সূক্ষ্মমাপের প্রচলন হয়েছে; ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে তাঁর প্রাক্‌-দূরবীক্ষণ যুগের যন্ত্রপাতি দিয়ে যে মাপগুলি করেছিলেন, সেগুলির বিচার থেকে জোহান্‌স্‌ কেপলার গ্রহগুলির চলাফেরার নিয়মাবলী আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন আইজ্যাক্‌ নিউটন তাঁর যুগান্তকারী মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের পরিবেশন করেছেন। এবং গতিবিদ্যার নিয়মাবলী দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। কোনও জ্যোতিষ্কের অবস্থানের পরিবর্তনের হিসাব থেকে এই নিয়মগুলির সাহায্যে তাদের ভবিষ্যৎ গতিধারাও নির্ণয় করা যাচ্ছে। সৌর জগতের বস্তুপিণ্ডগুলি যে উপবৃত্তাকৃতি কক্ষপথে চলে তা জানা ছিল; কেবল তাদের মাপ, উপকেন্দ্রীয়তা (Eccentricity) ও নতি (Inclination) বিভিন্ন। হ্যালি ধূমকেতুটির নিরীক্ষিত গতিপথের অংশটুকু থেকে এর সম্পূর্ণ কক্ষপথের হিসাব করলেন, এটি প্রত্যাশামতই এক বিরাট উপবৃত্তের সঙ্গে মিলে গেল। উপবৃত্তটি বেশি রকমের উৎকেন্দ্রিক, এবং এর সমতল ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে একটা স্থূলকোণে রয়েছে। এর অর্থ, ধূমকেতুটি গ্রহাদির আবর্তনধারার উল্টোদিকে তির্যক্‌ভাবে এক বিরাট উৎকেন্দ্রিক কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

জ্যোতির্বিদ্যার নথিপত্রে তখন আরও কয়েকটি ধূমকেতুর গতিপথের হিসাব ছিল, হ্যালি সেইগুলিরও বিচার করলেন। বিভিন্ন ধূমকেতুর কক্ষপথের মাপ, নতি এবং উৎকেন্দ্রীয়তা বিভিন্ন, কিন্তু তাদের মধ্যে দুটির প্রকার 1682 ধূমকেতুর সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে

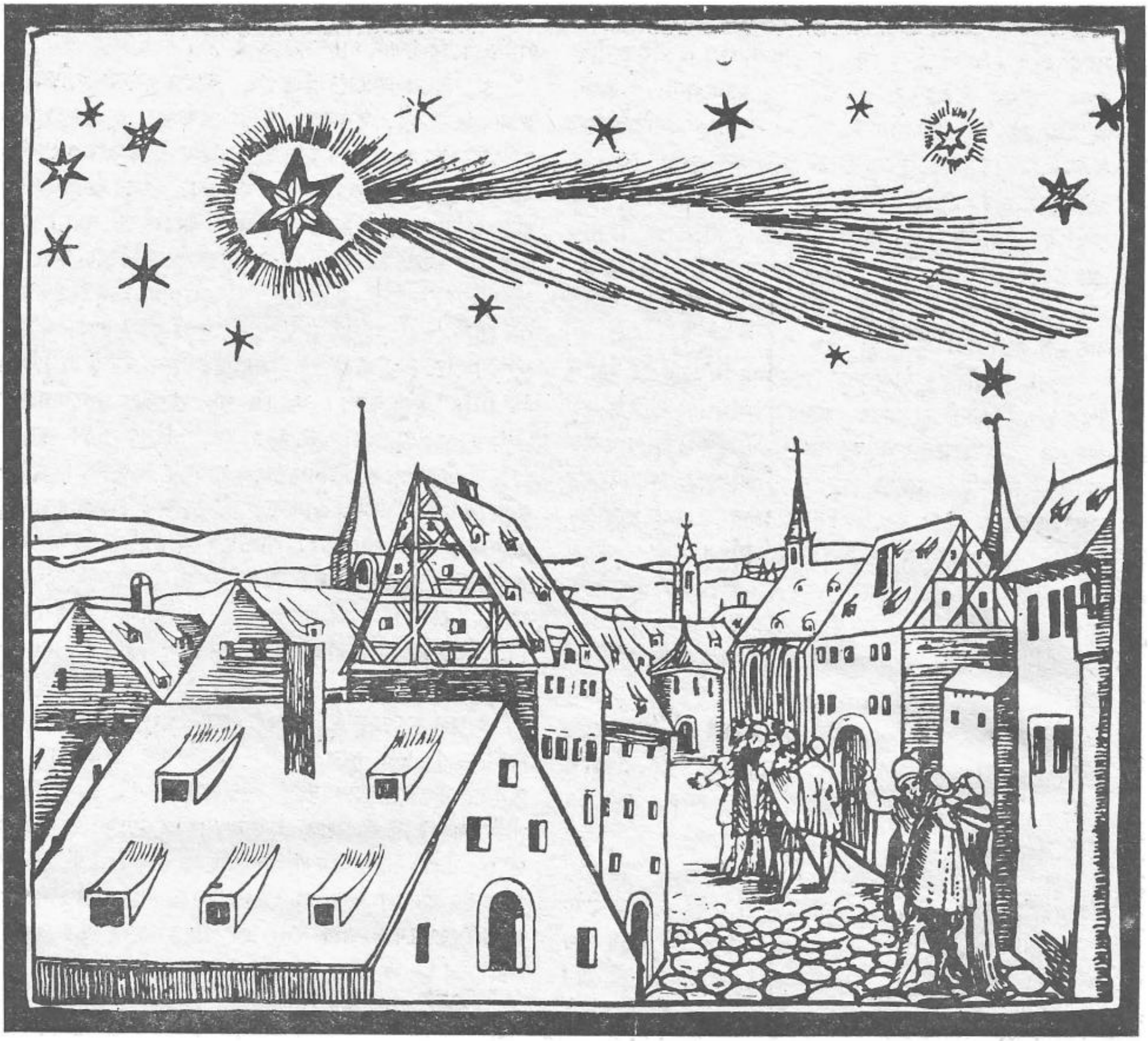

1556 সালের ধূমকেতু। জুরিখ, সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত

গেল। প্রথমটি হল 1607 খ্রীস্টাব্দের উজ্জ্বল ধূমকেতু যা কেপলার স্বয়ং এবং লঙ্গোমন্টানাস্ (Longomontanus) নামে আর এক জ্যোতির্বিদ্ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর দ্বিতীয়টি 1531 খ্রীস্টাব্দে আপিয়ান্ (Apian) নামে আর একজন জ্যোতির্বিদ্ মেপে রেখেছিলেন। কক্ষপথের মিল ছাড়া হ্যালি লক্ষ্য করলেন যে এ দুটির আবির্ভাব হয়েছিল একই সময়ের ব্যবধানে। তাছাড়া দেখা গেল পুরানো নথিপত্রে আরও একটি উজ্জ্বল ধূমকেতুর উল্লেখ রয়েছে 1556 সালে; আবার সেই পঁচাত্তর বছরের ব্যবধানে। এই সবের মধ্যেই হ্যালি খুঁজে পেলেন প্রকৃতির এক নতুন সত্যের সন্ধান। এ কটি ধূমকেতু একই বস্তু, প্রায় পঁচাত্তর বছর পর পর ফিরে আসছে, এবং তাহলে এটিকে আবার দেখা যাবে 1758 খ্রীস্টাব্দে।

দুনিয়ায় কুচক্রীর অভাব হয় না; হ্যালির এত বড় আবিষ্কারটি তাদের পছন্দ হল না। তারা বলল যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও অর্থই হয় না। কারণ এর সত্যাসত্য বিচার হ্যালির জীবদ্দশায় হওয়া সম্ভব নয়। হ্যালির যুক্তি বিচার ও হিসাবের উপর তারা কোনও গুরুত্বই দিল না। হ্যালি পরলোক গমন করলেন 1742 খ্রীস্টাব্দে; এবং তার 16 বছর বাদে 1758 সালে বিজ্ঞানীরা আবার সজাগ হলেন। বছরের অর্ধেকের বেশি কেটে গেল। তবু সেই ধূমকেতুর দেখা নেই। নিরাশাবাদীরা মুচকে হাসলেন। কিন্তু সবাই নয়। ক্লেয়ারো (Clairaut) নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী আরও সূক্ষ্ম হিসাব করে বললেন যে ধূম-কেতুটি ঠিকই আসছে। তবে শনিগ্রহ আর বৃহস্পতির কাছ দিয়ে আসার সময় একটু ধীরে চলার ফলে আরও

মাস চারেক দেরী হবে। নতুন হিসাবে সৌর পরিক্রমার সময় হবে 1759 খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল নাগাদ। বিজ্ঞানীরা নতুন পথের উপর নজর রাখতে লাগলেন। প্রথম আবিষ্কারের সৌভাগ্য মিলল এক সখের জ্যোতির্বিদের কপালে। 1758-র ক্রীস্‌মাসের রাত্রে জার্মানিরা জোহান পালিট্‌স্‌ (Johann Palitzsch) ধূমকেতুটিকে খুঁজে পেলেন। হ্যালির ভবিষ্যদ্বাণী আর ক্লেয়ারোর হিসাব এক সঙ্গেই প্রমাণিত হল। আনুষ্ঠানিক ভাবেই ধূমকেতুটির নামকরণ হল স্বর্গীয় হ্যালির নামে; কারুর আপত্তি করার কত মুখ ছিল না।

যখন হ্যালির ধূমকেতুর প্রত্যাবর্তনশীলতার প্রমাণ স্থির হল, বিজ্ঞানীরা আরও আগের নথিপত্র ঘাঁটতে শুরু করলেন। হ্যালির ধূমকেতু যথেষ্ট উজ্জ্বল তাই প্রতিবার আবির্ভাবের সময়ে নজরে এসেছে, এবং সেই নিরীক্ষণের বৃত্তান্ত কোথাও না কোথাও লিপিবদ্ধ আছে। এখন প্রয়োজন হল, তাদের মোটামোটি আবির্ভাবের তারিখ আর গতিপথ বিচার করা। হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে মিলে গেলে এগুলিকে অতীতের আবির্ভাব মনে করা যেতে পারে। শুধু সময় মিললে যথেষ্ট হবে না। অনেক বার একই বছরে একাধিক উজ্জ্বল ধূমকেতু দেখা গেছে। তাদের দুটিই হ্যালির ধূমকেতু হতে পারে না। পুরানো বৃত্তান্ত থেকে তাদের গতিপথের আন্দাজ করতে হল। অবশ্য সব ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া সম্ভব হ'ল না। বিশেষ করে সুদূর অতীতের নথিপত্রে।

সবচেয়ে পুরানো ধূমকেতুর বিবরণ পাওয়া যায় চীন দেশের লিপিতে। খ্রীস্টপূর্ব 2315 সালে। এটি হ্যালির ধূমকেতু হলেও হতে পারে। তার প্রায় 75 বছর পর খ্রীঃ পূঃ 2241 সালে আরও একটি ধূমকেতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ক্যামিয়েনস্কী (Kamiensky) মনে করেন যে খ্রীঃ পূঃ 1929 এর ধূমকেতুও হ্যালিরই একটি আবির্ভাব।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে কয়েকটি ধূমকেতুর পরোক্ষ উল্লেখ আছে। রাজা ডেভিড জেরুসালেমের উপর উন্মুক্ত তরবারি হাতে দেবদূতের দেখা পেয়েছিলেন; তার সঙ্গে খ্রীঃ পূঃ 1005-এর ধূমকেতুর আবির্ভাবকে অনেকে জড়িত করেন। খ্রীঃ পূঃ 626-এ একটি উজ্জ্বল ধূমকেতুর উল্লেখ আছে অনেক গ্রন্থেই। এবং আরও একটির খোঁজ পাওয়া যায় খ্রীঃ পূঃ 466 সালে। খ্রীঃ পূঃ 239-এর উজ্জ্বল ধূমকেতুটিকে আগে হ্যালির আবির্ভাব বলে মনে করা হ'ত, এখন নানা কারণে বোধ হয়—এটি একটি অন্য ধূমকেতু। বর্তমান ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীঃ পূঃ 86-র ধূমকেতুটিই হচ্ছে হ্যালির সবচেয়ে প্রাচীন আবির্ভাব। যা দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তির উপর স্থাপিত। সম্প্রতি ব্যাবিলোনের কয়েকটি শিলালিপির মাধ্যমে ঐতিহাসিকরা প্রমাণ পেয়েছেন খ্রীঃ পূঃ 162 সালের একটি ধূমকেতুর যেটি সবচেয়ে প্রাচীন হ্যালির আবির্ভাবের সম্মান দাবী করতে পারে।

খ্রীস্টোত্তর কালের ইতিহাস আরও অনেক পরিষ্কার। আমার মনে হয়, তখনকার লিপিলেখকরা ধূমকেতুগুলির আবির্ভাবকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য ঐতিহাসিক কোনও ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করতেন। যার থেকে পরে কার্যকারণের যুক্তি গুলিয়ে ফেলে ধূমকেতুগুলিকে অপবাদের ভাগী করা হয়েছে। তাই 11 খ্রীঃ পূঃ-র ধূমকেতুকে দায়ী করা হয় রোমান লোকনায়ক আগ্রিপ্পার (Agrippa) মৃত্যুর জন্য। 66 খ্রীস্টাব্দের ধূমকেতুটি জেরুসালেমের ধ্বংসের কারণ হয়ে পড়ে। 251 খ্রীস্টাব্দের ধূমকেতুটি হুন সম্রাট অ্যাটিলার (Atilla) মৃত্যু ঘটায়। যদিও খুব সম্ভবতঃ সংযোগগুলি কল্পনা করা হয়েছিল ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঠিক সময়ের হিসাব উত্তরকালের জন্য রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিং-বদন্তীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে দুটি উজ্জ্বল ধূমকেতু এসেছিল 684 এবং 837 খ্রীস্টাব্দে। হ্যালির হিসাব ধরে অতীতে গেলে দেখা যায় যে 837 খ্রীস্টাব্দের ধূমকেতুটি আমাদের চেনা। এবং সেবার এটি পৃথিবীর অতি নিকট দিয়ে গিয়েছিল। হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথের মূল নির্ধারক তথ্যগুলি নিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে 837 খ্রীষ্টাব্দের 9ই এপ্রিল ধূমকেতুটি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বে মাত্র শতকরা 4 ভাগ দূরে ছিল। এবারকার পরিক্রমায় সে তুলনায় সবচেয়ে কাছে দূরত্ব হবে শতকরা 42 ভাগ, 1986 খ্রীস্টাব্দের 11ই এপ্রিল তারিখে। ধূমকেতুটিকে তখন ভীষণ উজ্জ্বলভাবে দেখা দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রাচীন চৈনিক জ্যোতির্বিদদের কাহিনীতে দেখা যায় যে এই সময় ধূমকেতুর পুচ্ছটি আকাশের অর্ধেক ছেয়ে ফেলেছিল।

1066 খ্রীস্টাব্দে আবার হ্যালির ধূমকেতু এসেছিল বেশ উজ্জ্বলরূপে; তার ছবি বিখ্যাত বেয়োর বোনা কার্পেটে (Bayeux Tapestry) অমর হয়ে আছে। সেইরকম আর একটি বিখ্যাত শিল্পকীর্তি আছে ইতালিতে পাদুয়ায় (Padua) আরেনা গীর্জার দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলির (Arena Chapel Frescos) মধ্যে। ইতালিয়ান চিত্রকর জিয়োত্তো (Giotto) যীশুর জন্মের ইতিবৃত্তের ছবি এঁকেছিলেন, তাইতে বেথলেহেমের তারার রূপ দিয়েছিলেন নিজের চোখে দেখা ধূমকেতুর রূপে, যেটি তাঁর আঁকার বছর কয়েক আগে 1301 সালে দেখা গিয়েছিল। এটিও হ্যালির ধূমকেতুর আর একটি পরিক্রমা। এবারের হ্যালির ধূমকেতুর নিরীক্ষণের জন্য যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তারই একটি সংবাদপত্রের প্রচ্ছদপটে এই রকম একটি ছবির ব্যবহার করা হয়েছে।

1378-এর প্রত্যাবর্তনে ধূমকেতুটির রূপ ছিল ক্ষীণ; কিন্তু তার পরের বার 1456 খ্রীস্টাব্দে আবার খুব উজ্জ্বল

ভাবে এসেছিল। তার পরের বার জ্যোতির্বিদ আপিয়ান্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর মাপজোক করেছিলেন। এবং তারও পরের বার উপস্থিত ছিলেন আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার অন্যতম প্রবর্তক, জোহান্স্ কেপলার, যাদের মাপজোক হ্যালির অমর কীর্তিকে সম্ভব করেছিল, সেকথা আগেই বলেছি।

এ সবের মধ্যে একটা খেদের কারণ রয়ে গেছে যে আমাদের দেশের প্রাচীন নথিপত্রে এ ধূমকেতুটির কোনও বর্ণনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অথচ অতীতের এই আবির্ভাবগুলি এত উজ্জ্বল ছিল যে এগুলি লক্ষ্যে না পড়া অসম্ভব বললেই চলে। এই সময়গুলিতে যে আমাদের দেশে অরাজকতা চলছিল তাও নয়। উন্নত শিল্পকলা ও জ্ঞানের চর্চার জন্য নামকরা কেন্দ্রও ছিল অনেক দেশের বিভিন্ন স্থানে। 839 খ্রীস্টাব্দে যখন ধূমকেতুটি উজ্জ্বলরূপে আকাশ ছেয়েছিল, পূর্বভারতে তখন পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে; সে সময়ে বারাণসীতে জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল যেখানে দেশ বিদেশের ছাত্ররা পড়তে আসত; বাল্খের জ্যোতির্বিদ আবু মশহর এইখানেই দশবছর অধ্যয়ন করেছিলেন। 1066 খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে জ্ঞানের চর্চার খ্যাতি ছিল; কবি সামদেব এই সময়েই তাঁর কাব্যগ্রন্থ রচনা করে-

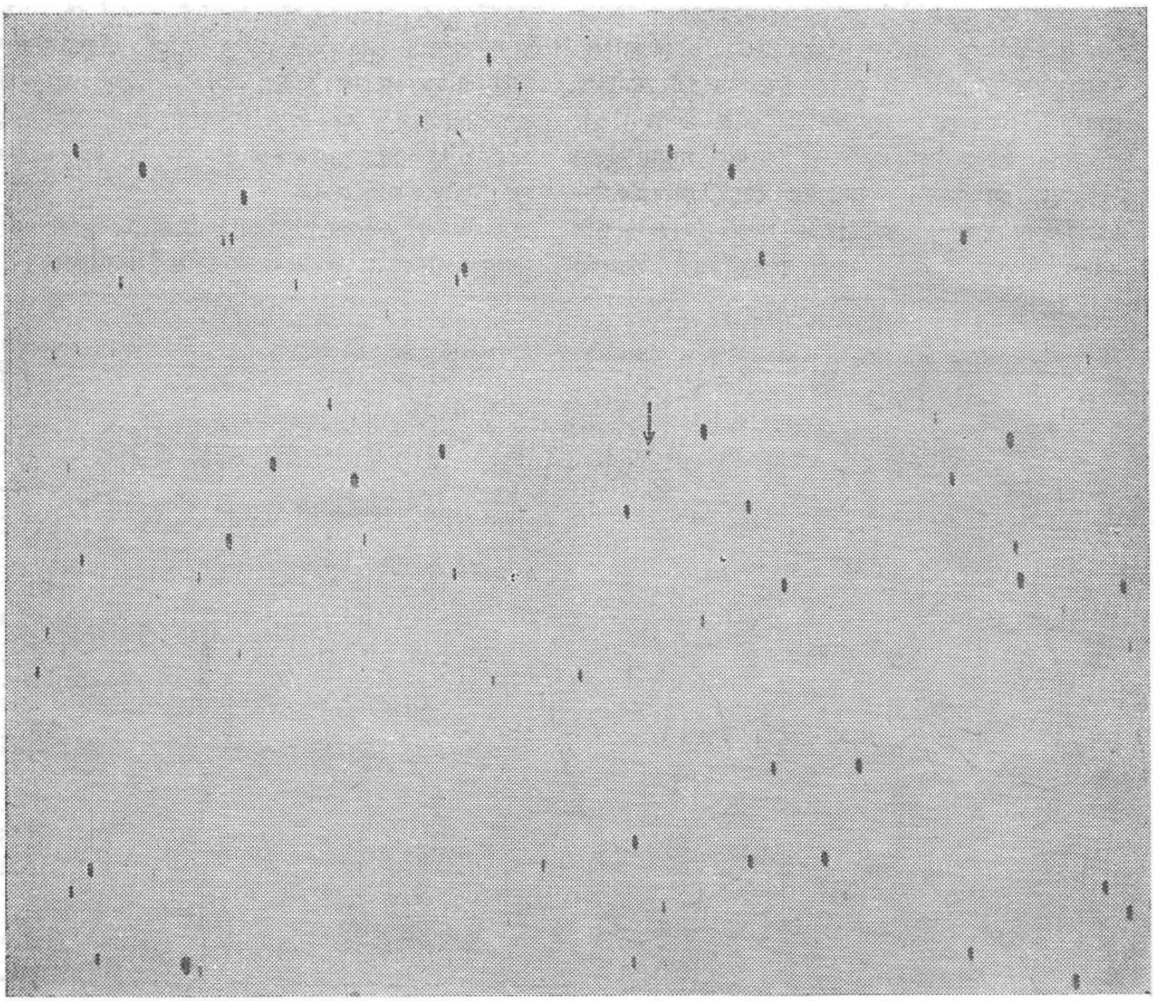

1985-86 তে হ্যালির ধূমকেতুর প্রথম আবির্ভাবের (তীর চিহ্নিত) ছবি। কাভালুর মানমন্দিরে 40″ টেলিস্কোপে 7 অক্টোবর 1985 তে তোলা।

ছিলেন। 1531-এ মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে। দিল্লীর সিংহাসনে হুমায়ূন, তাঁর সাহিত্যপ্রীতি সর্বজনবিদিত ; আকাশে এক অস্বাভাবিক রূপের জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবে কি কেউ কোনও ছবি আঁকে নি। কবিতা লেখেনি ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভালভাবে খোঁজ করলে আমাদের পুরানো পুঁথির মধ্যে এই ধূমকেতুটির বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে সেই অবদান হবে অমূল্য।

1759-এর প্রত্যাবর্তনের পরে হ্যালির ধূমকেতু আরও তিনবার এসেছে। 1835 সালে উন্নত টেলিস্কোপের সাহায্যে এটির মাপজোক হয়েছিল। তারপর 1910 সালে যখন এসেছিল, তখন ফোটোগ্রাফির প্রচলন হয়েছে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি বড় মানমন্দির থেকে তোলা ছবির সারিতে ধূমকেতুটির ক্রমবিবর্তনের রূপটি উত্তরকালের বিজ্ঞানীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। ধূমকেতুটির গঠন, উপাদান এবং গতিবিধি সম্বন্ধে বহু অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সে সময়। আমাদের দেশে কোদাইকানাল মানমন্দিরের ফোটোগ্রাফিক প্লেটের সংগ্রহের মধ্যে বহু ছবি রয়েছে সেবারের ধূমকেতুর বহুধা রূপের কিছুটা চিরস্থায়ী করে ধরে। তৃতীয় আবির্ভাব হচ্ছে বর্তমান পরিক্রমা ; ধূমকেতুটির ক্ষীণ ছবি ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে ; এবারের আয়োজন আরও অনেক বিস্তারিত।

এর আগে পর্যন্ত 'ধূমকেতুটি' নিরীক্ষিত হয়েছিল শুধু দৃশ্য আলোর মাধ্যমে। এর বস্তুকণা থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলোর সাহায্যে। কিন্তু সূর্যের তেজ প্রবাহের সংঘর্ষে এর উপাদানগুলি থেকে এর যে অন্য অনেক রকম বিকিরণ হতে পারে, তার স্বরূপ অধ্যয়নের কোনও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। এবার নানা আয়োজন। অবলোহিত এলাকায় মাপলে এর প্রাকৃতিক অবস্থার অনেক খবর পাওয়া যাবে। তাই সেইরকম যন্ত্রপাতির সম্ভার সাজানো হয়েছে অনেক মানমন্দিরে। বেতার তরঙ্গের উৎসগুলির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বিকিরণ ধারার যে পরিবর্তন হবে তাইতেও ধূমকেতুটির বিভিন্ন অংশের গঠনের অনেক গূঢ় তথ্য জানা যাবে। দৃশ্য আলোয় মাপার জন্যও বহু উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন হয়েছে। যার দ্বারা আরও অনেক সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ সম্ভব হবে।

সেই হিসাবে এবারের পরিক্রমায় হ্যালির ধূমকেতু আগেকার সবগুলি পরিক্রমার তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল থাকবে।

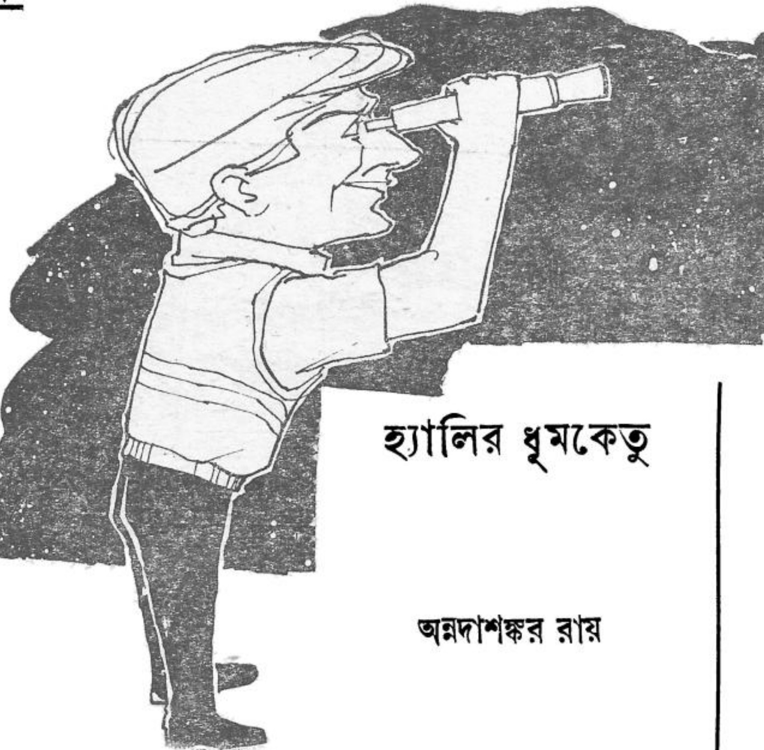

হ্যালির ধূমকেতু

অন্নদাশঙ্কর রায়

সরকার,
দূরবীনেতে নেইকো আমার একটুও দরকার।
তার হেতু!
খোলা চোখেই দেখেছিলুম হ্যালির ধূমকেতু।
সেটা কবে?
কিং এডওয়ার্ড গত হলেন ছেলেবেলায় যবে।
সেইবার
সন্ধ্যে হলেই দেখা যেত আলোর কী বাহার!
হোঁশ নাই
লক্ষ যোজন জুড়ে আছে আকাশে রোশনাই!
মাঝ রাতে
ঝাঁটার মতো পুচ্ছটা তার ছুঁতে পারি এই হাতে।
বোঝা যায়
আগুনের হল্কা যেন ছোঁয় এসে সারা গায়।
মনে ডর
ধূমকেতু কি আসছে নেমে আমার মাথার পর?
ষাট! ষাট!
ভাগ্যে আমার তেমন কোন ঘটেনি বিভ্রাট।
এইবার
শুনছি নাকি বাইনোকুলার হবেই দরকার।
তার হেতু
দূরে দূরেই আসবে যাবে হ্যালির ধূমকেতু।

আকাশে ওই আলোর ঝাঁটা

কৃষ্ণ ধর

দেখুন দেখুন, আকাশ পথে
আসছে ওটা কি?
দূর থেকে তো মনে হচ্ছে
আলোর জোনাকি।
চোখে লাগান দূরবীনটা
দেখুন পুবের ওই কোণটা
আসছে যেন আলোর ঝাঁটা
আকাশ উঠোন ঝেড়ে।
নয় জোনাকি আগুন-খাকি
এ-ধূমকেতু বানায় সেতু
আকাশ সীমা জুড়ে।
এই শতকের দশ সালেতে
এসেছিল উঁকি দিতে
বছর দেড়েক থেকেই উধাও
নেইকো দেখা আর
আসছে আবার ছিয়াশিতে
কথা রাখতে তার।
হাজার হাজার বছর ধরে
সূর্যদীঘল আকাশ ঘরে
একই বাঁকা কক্ষপথে
চলছে ম্যারাথন।
হ্যালি সাহেব অঙ্ক কষে
তারার জগৎ চষে চষে
বলেছিলেন, এ-ধূমকেতুর
আসা যাওয়ার ক্ষণ।
সত্তর আর পাঁচটি বছর
লাগবে পেতে তারই খবর
ভবঘুরে এ-ধূমকেতু
ফিরে আসবে কি?
হ্যালি সাহেব বলে গেছেন
কে দেয় তাঁরে ফাঁকি।

খালি চোখে হ্যালির ধূমকেতু

বিমান বসু

হ্যালির ধূমকেতু প্রায় 76 বছর পর আবার পৃথিবীর আকাশে ফিরে আসছে। তাকে দেখবার জন্য নিশ্চয়ই তোমরা খুবই উদ্বিগ্ন। হবে না—ই বা কেন। এতো আর বার বার দেখার জিনিস নয়—জীবনে একবারই এর দেখা মেলে। আজ পর্যন্ত দুবার হ্যালির ধূমকেতুকে দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছে। আর তাই এত তোড়জোড়।

গতবার হ্যালির ধূমকেতুকে দেখা গিয়েছিল 1910 সালে। সে সময় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সেবার ধূমকেতুটি ছিল খুবই উজ্জ্বল। শুধু চোখেও তাকে পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল এবং তার পুচ্ছটি ছিল বিশাল। ঐ সব বর্ণনা পড়ে তোমরা হয়ত আশা করবে যে হ্যালি ধূমকেতুকে এবারেও সেরককমই দেখা যাবে। আসলে তা কিন্তু হবে না। কারণ এবারে হ্যালি যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল হবে যে সময় সে থাকবে সূর্যের যেদিকে পৃথিবী, তার উল্টো দিকে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তখন তাকে দেখাই যাবে না। গতবারে এসময় সে ছিল সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে। সূর্য পরিক্রমার পর হ্যালিকে যখন আবার পৃথিবী থেকে দেখা যাবে তখন আবার গতবারের তুলনায় তার দূরত্ব হবে অনেক বেশি। গতবারে যখন হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছিল তখন তার দূরত্ব ছিল মাত্র 2,10,00,000 কিলোমিটার। এবারে সে দূরত্ব হবে 6,30,00,000 কিলোমিটার, অর্থাৎ, গতবারের তুলনায় তিনগুণ। সুতরাং সব দিক দিয়েই এবারে অবস্থা প্রতিকূল। তবে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আগে থাকতে তৈরী হয়ে থাকলে তোমরা অনায়াসে এবারেও ঐ ঐতিহাসিক ধূমকেতুটিকে দেখতে পাবে। তার জন্য কি করতে হবে এবারে তাই বলব।

আগেই বলেছি যে গতবারের মত এবারে হ্যালির ধূমকেতুকে মোটেই উজ্জ্বল দেখাবে না। সুতরাং, আকাশ একেবারে পরিষ্কার না থাকলে হয়ত তাকে দেখা কঠিন হতে পারে। বায়ুমণ্ডলের ধোঁয়া বা ধুলো অথবা রাস্তার তীব্র বিজলী বাতির আলো—এসবই এবারে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখায় বাধার সৃষ্টি করতে পারে। সবচেয়ে মুস্কিল ব্যাপার এই যে, যখন ধূমকেতুটিকে শুধু চোখে দেখা যাবে সে সময় সে থাকবে আকাশে খুবই নিচে, দিগন্তের অল্প ওপরে যেখানে ধোঁয়া ধুলোকে সব চেয়ে ঘন দেখায়। ধোঁয়া ধুলো ছাড়াও, বড় শহরের রাস্তায় আজকাল যে সব বিজলী বাতির আলো ব্যবহার করা হচ্ছে তা থেকে আকাশে এত আলো ছড়ায় যে সাধারণ অবস্থায় শহরের আকাশে তারা চোখে পড়ে না। সুতরাং এদিক দিয়েও অবস্থা সঙ্গীন বলা যেতে পারে। তবে এর প্রতিকারের উপায় আছে।

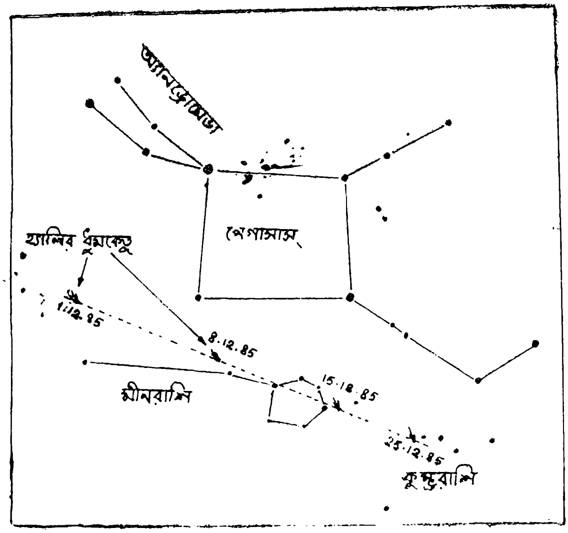

তোমরা জানো, শহরের মধ্যে ধুলো ধোঁয়া বেশি, আলোও বেশি। যে কোনও উপায়ে এগুলি এড়াতে হবে। যদি শহরে থাকো তাহলে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এমন কোনও

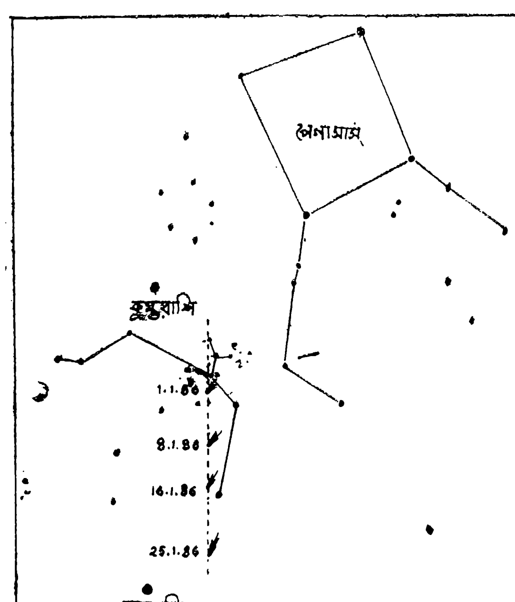

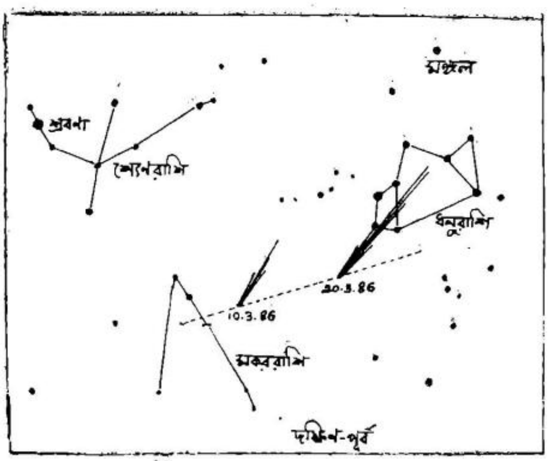

জায়গা বেছে নাও যেখান থেকে রাত্তিরে দক্ষিণ দিগন্তের আকাশ বিজলীবাতির আভাহীন, অন্ধকারময় দেখায়। আর যদি শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে পারো তাহলে তো কথাই নেই। তবে মনে রেখো যেখানেই যাও সেখান থেকে দক্ষিণপূর্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্ত যেন পরিষ্কার দেখা যায়। সামনে কোনও পাহাড়, টিলা বা অন্য কোনও বাধা থাকলে কিন্তু চলবে না।

ধরো এমন একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছ—যেখানে ধুলো ধোঁয়া নেই, বিজলী বাতির তীব্র আলোও নেই। তাতেও কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হলো না, কারণ এমন জায়গা থেকেও হ্যালির ধূমকেতুকে সব সময় হয়ত দেখা যাবে না। কারণটা আর কিছু নয়, চাঁদের আলো। আকাশে যদি চাঁদ থাকে, বিশেষ করে শুক্লপক্ষের সপ্তমী থেকে নিয়ে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী পর্যন্ত (যে সময় চাঁদের আলো বেশ প্রখর)। তাহলে সে সময় হ্যালিকে হয়ত দেখা যাবে না। সুতরাং, আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে—যে সময় হ্যালি আকাশে সে সময় আকাশে চাঁদ থাকলে চলবে না।

হ্যালির ধূমকেতুকে এবছরের ডিসেম্বর মাস থেকে নিয়ে আগামী বছরের এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত শুধু চোখে দেখা যাবে। অবশ্য মাঝে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রায় পুরোটাই সূর্যের অপর দিকে থাকার দরুণ তাকে দেখা যাবে না। কিন্তু বাকি সময়ের সবটাতেই যে আমারা তাকে দেখতে পাবো তা নয়। কারণ আগেই বলেছি—চাঁদের আলো।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। ডিসেম্বর থেকে নিয়ে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত হ্যালিকে দেখা যাবে সন্ধ্যার আকাশে, ঠিক সূর্যাস্তের পর। আবার মার্চ থেকে নিয়ে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাকে দেখতে পাবে শেষ রাত্তির বা ভোরের আকাশে, সূর্যোদয়ের ঠিক আগে। সুতরাং ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সূর্যাস্তের পর আকাশে চাঁদ থাকলে হ্যালিকে দেখা যাবে না। আবার মার্চ-এপ্রিলে শেষ রাত্তিরের আকাশে চাঁদ থাকলে চলবে না। এইসব হিসেব করে দেখা গেছে যে হ্যালিকে দেখার জন্য উপযুক্ত চারটি উত্তম সময় রয়েছে যে সময় আকাশে চাঁদ থাকবে না (1 নং তালিকা দেখ)।

আরও একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা এতক্ষণ চিন্তা করিনি। তা হলো আবহাওয়া। যদি আকাশে মেঘ থাকে তাহলেই তো সব মাটি। সুতরাং আমাদের জানতে হবে হ্যালি যখন আকাশে আবহাওয়া তখন কেমন থাকবে।

শিলালিপিতে হ্যালির ধূমকেতু

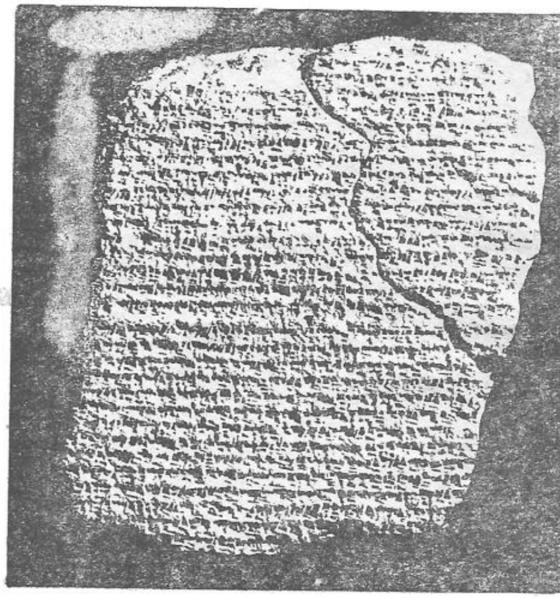

হ্যালির ধূমকেতুর প্রথম প্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটে 1758 সালে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডমণ্ড হ্যালির ভবিষ্যৎবাণী অনুসারেই সে বছর 25শে ডিসেম্বর পৃথিবীর আকাশে ধূমকেতুটিকে দেখা যায়। পরে এডমণ্ড হ্যালির নামানুসারেই ধূমকেতুটির নাম রাখা হয়।

কিন্তু 1758 সালের আগেও বহুবার, গড়ে প্রতি 76 বছর অন্তর ধূমকেতুটিকে পৃথিবীর আকাশে দেখা গেছে। ধূমকেতুটির আবির্ভাবের সর্বপ্রথম বিবরণ পাওয়া গেছে চীন থেকে খ্রীস্টপূর্ব 240 সালে লিপিবদ্ধ নথিপত্রে। সম্প্রতি লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ব্যাবিলন যুগের শিলা-লিপিতে খ্রীস্টপূর্ব 164 সালে ধূমকেতুটির আবির্ভাবের বিবরণ খুঁজে পেয়েছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। তাঁরা মনে করে খ্রীস্টপূর্ব 12 সালের আগে লিপিবদ্ধ করা হ্যালির ধূমকেতুর বিবরণগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে নিখুঁত বিবরণ। ছবিতে শিলালিপিটি দেখানো হয়েছে।

এ বিষয় নিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন কলকাতার পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টারের পরিচালক শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ত্রিশ বছরের আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি এমন কয়েকটি ছোট শহরের তালিকা তৈরি করেছেন যেখানে জানুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে আবহাওয়া পরিষ্কার মেঘ মুক্ত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। পশ্চিমবঙ্গের এমন শহরগুলির নাম—কুচবিহার, ডায়মণ্ড হারবার ও মালদা।

১নং তালিকা

হ্যালির ধূমকেতুকে দেখা যাবে

অমাবস্যা	পূর্ণিমা	মাস ও তারিখ
ডিসেম্বর 12	ডিসেম্বর 27	সূর্যাস্তের পর ডিসেম্বর 3—15
জানুয়ারি 10	জানুয়ারি 26	সূর্যাস্তের পর জানুয়ারি 3—14
মার্চ 10	মার্চ 26	সূর্যোদয়ের আগে মার্চ 8—21
এপ্রিল 9	এপ্রিল 24	সূর্যোদয়ের আগে এপ্রিল 6—16

এতক্ষণ তোমাদের হ্যালির ধূমকেতুকে দেখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের বিষয় বললাম। এবার দেখা যাক্ হ্যালিকে তোমরা চিনবে কি করে। আগেই বলেছি, এবারে হ্যালির ঔজ্জ্বল্য খুবই কম হবে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। সুতরাং তাকে চিনতে প্রথমে অসুবিধে হতে পারে। ডিসেম্বর—জানুয়ারিতে তো হ্যালির পুচ্ছ এত ছোট থাকবে যে তাকে সহজে খুঁজে নাও পেতে পারো। তবে আকাশে বিভিন্ন তারামণ্ডলগুলিকে যদি তোমরা ভালোভাবে চিনে নিতে পারো তাহলে বিশেষ অসুবিধে হবে না। (তারামণ্ডল পরিচয় নিয়ে ধারাবাহিক রচনা "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে" 1983 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা পড়ে নিলেই চলবে।) তারামণ্ডলগুলি চেনার পর চিত্র নং 1, 2, 3 এবং 4 থেকে অনায়াসে হ্যালিকে তোমরা খুঁজে নিতে পারবে। ছবিতে পুচ্ছের দৈর্ঘ্যের একটা আন্দাজ দেখানো হয়েছে—যাতে করে খুঁজে নিতে সুবিধে হয়।

সবশেষে একটা কথা মনে রেখো। ঘরের আলো থেকে বেরিয়ে যদি ধূমকেতু দেখতে যাও তাহলে অন্তত পনেরো মিনিট অন্ধকারে থাকার পরই চেষ্টা করো। না হলে হয়ত প্রথমে আবছা আলোর রেখার মত হ্যালিকে খুঁজেই পাবে না।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য একমাত্র অপরিহার্য পাঠ্য পুস্তক

- **পদার্থবিদ্যা (১ম ও ২য়)**
  ডক্টর অলক চক্রবর্তী
  ডক্টর হরিনারায়ণ কুণ্ডু
- **ব্যবহারিক পদার্থ বিদ্যা**
  ডঃ অলক চক্রবর্তী
- **A Text Book on Physics (Vols I & II)** Dr. Alok Chakraborty
- **রসায়ন বিদ্যা (১ম ও ২য়)**
  প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত
  শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
- **অর্থ বিদ্যার রূপরেখা**
  অধ্যাপক অলক ঘোষ
  নারায়ণচন্দ্র সাহা
- **ব্যবসায় অর্থ বিদ্যা ও ব্যবসায় গণিত**
  অধ্যাপক অলক ঘোষ
  নারায়ণচন্দ্র সাহা ও ডঃ দিলীপরঞ্জন রায়
- **পৌরবিজ্ঞানের রূপরেখা**
  অধ্যাপক অলক ঘোষ ও কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
- **উচ্চমাধ্যমিক কারবার সংগঠন**
  অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
- **Concept of Business Organisation**—
  Prof. J. P. Bose
- **আধুনিক ভারতের ইতিহাস**
  ডঃ দিলীপ ঘোষ
- **ইউরোপ ও পৃথিবী**
  ডঃ দিলীপ ঘোষ

দি নিউ বুক স্টল
পুস্তক প্রকাশক ॥ রপ্তানীকারক ॥ বিক্রেতা
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
গ্রাম :—BHALOBOI

স্যার এডমণ্ড হ্যালি

অমরনাথ রায়

নাম শুনেই বোঝা যায় যে ইনিই সেই জ্যোতির্বিদ, যাঁর নামে হ্যালির ধূমকেতু এবং যে ধূমকেতুটিকে আগামী বছর অর্থাৎ 1986 খ্রীস্টাব্দে আমরা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাব।

হ্যালি ছিলেন একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এবং বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের খুব ঘনিষ্ঠ। যদিও হ্যালি ছিলেন নিউটনের চাইতে প্রায় চৌদ্দ বছরের ছোট, তবুও তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল বড়ই মধুর।

এডমণ্ড হ্যালির বাবা লণ্ডন শহরে ব্যবসা করতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও খুব ভাল ছিল। ছেলেবেলায় এডমণ্ড লণ্ডনের সেন্টপল স্কুলে লেখাপড়া করতেন। সেখান থেকে পাশ ক'রে 1671 খ্রীস্টাব্দে তিনি লণ্ডনের কুইন্স কলেজে ভর্তি হন্। কলেজ জীবন থেকেই এডমণ্ড জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। ঐ বিষয়টি তিনি এত ভালবাসতেন যে কলেজের পড়া শেষ হবার আগেই তিনি চলে যান সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। উদ্দেশ্য—দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান মানচিত্রে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা। এ কাজে তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন ইংলণ্ডের তখনকার দিনের 'অ্যাস্ট্রনমার রয়্যাল' স্যার জন ফ্লামস্টিড। যাই হোক্, এডমণ্ড এই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রে 'দু' বছর বাদে দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁকে এই কাজের স্বীকৃতি ও সম্মানস্বরূপ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ. ডিগ্রী দেন। এ ভিন্ন তিনি তখনই ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো অর্থাৎ সদস্য নির্বাচিত হন। তরুণ এডমণ্ডের বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর। হ্যালি দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থানের যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, সেটিকে উৎসর্গ করেছিলেন ইংলণ্ডের তখনকার দিনের রাজা চার্লস এর নামে। গ্রহের কক্ষপথ সম্পর্কিত তাঁর প্রথম নিবন্ধটি 1676 খ্রীস্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির 'ফিলসফিক্যাল্ ট্রানজ্যাকৃশন' এ প্রকাশিত হয়।

চব্বিশ বছর বয়সে হ্যালি বেরোন ইউরোপ ভ্রমণে। সেই সময় ইউরোপের প্রায় সব নাম করা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পোল্যাণ্ডে থাকার সময় ডানজিগের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হেভেলিয়াসের সঙ্গে যুগ্মভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ ক'রে কিভাবে পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব সূক্ষ্ম ভাবে জানা যায় তার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তিনি।

1682 খ্রীস্টাব্দে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে। হ্যালি ঐ ধূমকেতুর কক্ষপথ সম্পর্কে গণনা করেন এবং নিউটনের গতিসূত্র অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ঐ ধূমকেতুটি আবার দেখা যাবে 1758 খ্রীস্টাব্দে। হ্যালির

এই নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়। ঐ ধূমকেতুটি তখন থেকেই 'হ্যালির ধূমকেতু' নামে পরিচিত হয়। সেই থেকে প্রতি 76 বছর অন্তর হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব ঘটছে। 1758 খ্রীস্টাব্দের পর 1834 খ্রীস্টাব্দে এবং তারপর 1910 খ্রীস্টাব্দে এই ধূমকেতুটিকে দেখা গিয়েছিল হ্যালির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে। আবার একে দেখা যাবে 1986 খ্রীস্টাব্দে। সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিদেরা এখন আসন্ন হ্যালির ধূমকেতুকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণের জন্যে জোর তোড়জোড় চালাচ্ছেন।

ধূমকেতুর কক্ষপথ যে পর্যায়বৃত্ত হ'তে পারে—একথা হ্যালির আগে আর কেউ বলেন নি। জ্যোতির্বিদ্যায় হ্যালির গবেষণাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো নক্ষত্রদের যথার্থ গতি নির্ণয় ও চন্দ্রের মধ্যগতির ত্বরণ আবিষ্কার। আবার শুক্রগ্রহের সংক্রমণের (ট্রানজিট) সাহায্যে তিনি সূর্যের লম্বন (সোলার প্যারাল্যাক্স) নির্ধারণ করেন।

জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়াও নানা বিষয়ে হ্যালির আগ্রহ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংলিশ চ্যানেলের ন্যাভিগেশনাল চার্ট তৈরি, সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মধ্যে চৌম্বক বলরেখা ধরে সেই স্থানের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় পদ্ধতি, এক নতুন ধরনের বল-বিয়ারিং তৈরি ও দুর্গ নির্মাণের এক বিশেষ কৌশল উদ্ভাবন প্রভৃতি হ্যালির প্রতিভা স্বাক্ষর বহন করে।

হ্যালির চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। স্যার আইজাক নিউটনের একখানি বিশ্ববিখ্যাত পাণ্ডুলিপি 'প্রিন্সিপিয়া' তিনিই অর্থব্যয় করে প্রকাশ করেছিলেন। প্রিন্সিপিয়া প্রকাশিত হবার পর নিউটনের খ্যাতি হ্যালির চেয়ে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেলেও এই দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে বন্ধুত্ব কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

1742 খ্রীস্টাব্দে এই খ্যাতনামা ইংরেজ জ্যোতির্বিদের জীবনাবসান ঘটে।

জ্যোতির্বিদ হ্যালি আজ নেই, কিন্তু তাঁর নামাঙ্কিত ধূমকেতুটি রয়েছে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে।

ধূমকেতু রাধাগোবিন্দ চন্দ্র

1910 খ্রীস্টাব্দে 24-এ এপ্রিল, বাংলা 13 7 সালের 11ই বৈশাখ রবিবার শেষরাত্রি সাড়ে চারি ঘটিকার সময়ে হ্যালির ধূমকেতু এদেশে প্রথম শুধুচক্ষে মানব নয়নের গোচরীভূত হয়। তখনও উহাকে শুধুচক্ষে ধূমকেতু বলিয়া চেনা যায় নাই। আমরা 'বাইনোকুলার' দ্বারা প্রথমে ধূমকেতু খুঁজিয়া বাহির করি। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে, 18ই এপ্রিল ধূমকেতু-শুধুচক্ষে দেখা যাইবে। তৎপরে পুনঃ সংবাদ আসিল যে, 19-এ এপ্রিল ধূমকেতু সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতম হইয়া লোক লোচনের গোচরীভূত হইবে। আমরা এই সিদ্ধান্তমতে 18ই এপ্রিল শেষরাত্রে ধূমকেতু খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই, তারপরে প্রতি শেষরাত্রে উহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকি। এমন সময়ে বোলপুরে শান্তিনিকেতন হইতে জগদানন্দ রায় মহাশয় আমাদের পত্রের উত্তরে পুনঃ লিখিলেন যে, 24-এ এপ্রিলের পূর্বে উহাকে শুধুচক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। কদাইকানল মানমন্দিরের অধ্যক্ষ মিঃ জে. এভারশেড আমাদের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি 18ই এপ্রিল স্ট্যাণ্ডার্ড শেষরাত্রি সাড়ে চারিটার সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারার ন্যায় হ্যালির ধূমকেতু প্রথম দেখিতে পান, তখন উহার পুচ্ছ 5° দীর্ঘ হইয়াছিল। অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন যে, "এত পূর্বে উহাকে শুধুচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা আমি অনুমান করিতে পারি নাই" কদাইকানল হইতে এত পূর্বে দেখিতে পাইবার একটা কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি, যেহেতু কদাইকানল আমাদের দেশ হইতে বহু দক্ষিণে অবস্থিত, ঐ সময়ে ধূমকেতুও আমাদের দ্রাঘিমা হইতে অনেক দক্ষিণে ছিল। সুতরাং দক্ষিণ দেশবাসী লোকের পক্ষে আমাদের আগে উহাকে দেখিতে পাইবার কথা।

আমরা শুকতারার (Venus) একটু নীচে, পক্ষিরাজ রাশির গোপদ (*γ* Pegasi) তারার দক্ষিণে ক্ষুদ্র তারার ন্যায় ধূমকেতু প্রথম দেখিতে পাই। বাইনোকুলারে উহার সামান্য একটু পুচ্ছ দেখা গেলেও শুধুচক্ষে তখন ধূমকেতু বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। পরে কয়েকদিনের মধ্যেই পুচ্ছ দেখা যাইতে লাগিল। ঐ সময়ে কৃষ্ণপক্ষ বিধায় শেষরাত্রে জ্যোৎস্নার জন্য ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না। ধূমকেতু প্রথমে শুকতারার কিছু নীচে দেখা যায়, পরে 2রা মে, 19-এ বৈশাখ সোমবার পর্যন্ত উপরে উঠিতে থাকে। ঐ দিন উহা শুক্রের সর্বাপেক্ষা নিকটতম হইয়াছিল। ঐ দিন ধূমকেতুর পুচ্ছে শুক্র আবৃত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা না হইলেও পুচ্ছের গা ঘেঁষিয়া বিদ্যমান ছিল। হয়তো পুচ্ছের প্রান্তস্থ অনিবিড় অংশ শুক্রের উপরে ছিল তাহা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 1লা মে (য়্যাষ্ট্রনমির মতে) শেষরাত্রি স্ট্যাণ্ডার্ড 4টা 40 মিনিট হইতে 5টা 10 মিনিটের মধ্যে মিঃ এভারশেড হ্যালির ধূমকেতুর বর্ণচ্ছত্রের যে ফটো তোলেন তাহাতে বর্ণচ্ছত্রের পার্শ্বেই শুক্রকে দেখা যাইতেছে, শুক্রের উপর দিয়া অনিবিড় পুচ্ছও বিদ্যমান রহিয়াছে। 2রা মে-র (সিভিল তারিখ) পর হইতে ধূমকেতু পুনরায় নীচে নামিতে থাকে। ধূমকেতুর এবম্বিধ গতি সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন, তবে যাঁহারা (শুক্র গ্রহকে পশ্চিম দিকে অস্তমিত, পূর্বে উদিত ও পুনঃ পূর্ব দিকে অস্তমিত ও পশ্চিম দিকে উদিত হইতে দেখিয়াছেন এবং) শুক্রের গতিবিধির সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন। ধূমকেতুর গতি প্রথমে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ছিল। পরে সূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে উহার গতি পরিবর্তন হয়, এবং 19-এ মে (য়্যাস্ট্রনমির মতে 18ই মে) 5ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া পূর্বদিকেই গতিক্রমে, শুক্রের পশ্চিম গগনে অস্তের ন্যায় অস্ত গিয়া, পরদিন সন্ধ্যার পরে পশ্চিম গগনে, শুক্রের পূর্বগগনে উদয়ের ন্যায় উদিত হয়।

9ই মে, 26-এ বৈশাখ, সোমবার অমাবস্যার পরে হ্যালির ধূমকেতুর পূর্ণ অবয়ব প্রকট হইতে থাকে। 10ই মে, 27-এ বৈশাখ মঙ্গলবার রাত্রি ২টা ৩০ মিনিটের সময়ে আমরা ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করি, তখন কেতুর পুচ্ছের সামান্য অংশ মাত্র পূর্ব গগনপ্রান্তে দেখা দিতেছিল। ক্রমে ধ্রুবমাতা (Andromedae) রাশির প্রতিষ্ঠা বা উত্তর ভাদ্রপদা (Andromedae) নক্ষত্রের উদয় হইল, তখন পুচ্ছ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। পরে পক্ষিরাজ (Pegasus) রাশির গোপদ (γ Pegasi) তারা উঠিল। তখনও কেতুমুণ্ড অদৃশ্য, কিন্তু বিশাল পুচ্ছ পূর্ব গগন পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে ধূমকেতুর তারাগোলক, 3টা 12 মিনিটের সময়ে, দিগ্বলয়ের উপরে অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল এবং 3টা 20 মিনিটের সময়ে সমুণ্ড বিশাল ধূমকেতু আমাদের দৃষ্টি পথবর্তী হইল। হ্যালির ধূমকেতু ঐ দিনের উদয় বড়ই মনোরম বোধ হইল।

স্বভাববিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র কোন বড় মানমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। অথচ বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর ছিল যোগাযোগ। রচনাটি 1910 সালে তাঁর দেখা হ্যালির ধূমকেতুর চাক্ষুষ বিবরণের নির্বাচিত অংশ।

সংগ্রহ সূত্র : ধূমকেতু : রাধাগোবিন্দ চন্দ্র ॥ পুঁথিপত্র ॥

হ্যালি আসছে

রঞ্জন ভাদুড়ী

ছিয়াত্তরটি বছর দিয়ে তৈরি আকাশ-সেতু
তাই পেরিয়ে দিচ্ছে দেখা হ্যালির ধূমকেতু।
ধূমকেতুদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে খানদানি
হ্যালি-নামের ধূমকেতু সে—সবাই এটা মানি।

*　　*　　*　　*

আগে মানুষ ধূমকেতুকে ভাবত অলক্ষুনে,
সৌরজগৎ-বহির্ভূত সর্বনেশে, খুনে!—
দেখা দেওয়া মানেই হল এই পৃথিবীর ক্ষতি—
যুদ্ধ মড়ক ভূমিকম্পো ঘটবে অবনতি।

সেই ধারণা দূর করলেন আইজাক নিউটন,
হ্যালি ছিলেন নিউটনেরই নিকটবন্ধুজন—
ছিলেন তিনি রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী;
তাঁর নামে এই ধূমকেতুটির নাম হয়েছে জানি।

হাজার-দুশো-বিরাশিতে দেখেন তিনি এটা—
গ্রহ-তারার মধ্যে হঠাৎ জ্যোতিষ্ক কেউকেটা।
সন্ধানী চোখ রাখেন হ্যালি ধূমকেতুটির দিকে—
কখন সেটা উজ্জ্বল হয়, কখন-বা হয় ফিকে!
কীভাবে সে করতে থাকে সূর্য-পরিক্রমা—
অঙ্ক কষে বিস্তারিত তথ্য করেন জমা।

বলেন শেষে—ছিয়াত্তরটি বছর পরে-পরে
ধূমকেতুটি এই পৃথিবীর লক্ষ্যে প্রবেশ করে।
সেই হিসেবে এই বছরই আবার যাবে দেখা।
আর ক'টা দিন সবুর করো—দেখো না কেউ একা।
দেখার জিনিস সবাই মিলে দেখলেই আনন্দ,
একলা-একা দেখলে পরে বলবে সবাই মন্দ।

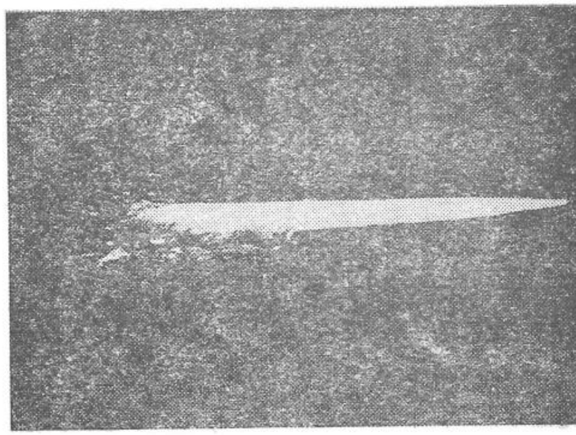

হ্যালির সন্ধানে গিওত্তোর মহাকাশযান

রবীন সুর

বাপ পিতামো যা ভেবেছেন কথাটা কতো খাঁটি?
ধূমকেতুটা অমঙ্গলে রোগের বড় ঘাঁটি—
বন্যা প্লেগ আজব 'ফ্লু' কলেরা মহামারি
এ সব নাকি তারই কম্ম—শতের ঝকমারি!
সূত্র নিয়ে পণ্ডিতের তর্ক আছে বটে—
কারণ বিনা কোনো কিছু কি আকস্মিক ঘটে?
বিজ্ঞানীরা ঘুমিয়ে নেই, জানতে গূঢ় সত্য
আকাশ ছেঁকে নিয়ে আসবে না-জানা সব তথ্য।
সূর্য ঘেঁষে ধূমকেতুটার বিশাল কক্ষপথে
'গিওত্তোর' রকেটখানি পাড়ি দিয়েছে রথে,
লক্ষ স্থির, উড়ছে দূরে অ্যান্টেনাকে তুলে—
কম্প্যুটার কারসাজিতে জানাবে জট খুলে:
ধূমকেতু কি আদি প্রাণের প্রথম আঁতুড় ঘর,
ব্যাক্টেরিয়া ভাইরাসেতে আগন্তুক কতটা জর্জর?
অনেক কিছু উল্টে যাবে গালগপ্প গাথা,
কানে শোনায় আস্থা নেই, যন্ত্রে আছে মাথা,
ছিয়াত্তর বছর পরে উদয় হবে যার—
'গিওত্তোর' নাড়িটা টিপে সব জানাবে তার।

পশ্চিমবঙ্গে উন্নততর পরিবেশ একটি দৃঢ় অঙ্গীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তর এ রাজ্যে পরিবেশ রক্ষা করতে, পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। গত দু বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ে এই লক্ষ্যে গৃহীত নানা ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক এখানে উল্লেখ করা হল।

শিল্পের কারণে বায়ু ও জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ করেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ। এঁরা এ পর্যন্ত ৬৭৮টি সংস্থাকে নদী, কূপ বা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীতে শিল্পজাত আবর্জনা নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন—এর মধ্যে কিছু কিছু সংস্থাকে নতুন করে অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫২টি ক্ষেত্র সহ মোট ১৪৬টি ক্ষেত্রে এ অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বৃহদাকার দূষণকারীদের চিহ্নিত করে ২৪টি শিল্পে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে শিল্পজাত আবর্জনা প্রক্রিয়ণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫২টি শিল্পকে প্রক্রিয়ণ ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কারখানার ধোঁয়া ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪-৮৫ সালে ১১০টি সংস্থা চিমনি তৈরির কাজ শেষ করেছে। আলোচ্য সময়ে আরও ৩৪০টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।

হুগলী ও চূর্ণী নদীর জলের দূষণ মাত্রা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ গত চার বছর ধরে এই দুই নদী নিয়মিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

জোরালো হর্ন এবং কালো ধোঁয়ার উৎপাত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। কালো ধোঁয়া ছাড়া এবং নিষিদ্ধ হর্ন বাজানোর কারণে এ পর্যন্ত ১৭৬টি গাড়ির সার্টিফিকেট এবং ফিটনেস সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

পরিবেশগত শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নেওয়ার জন্য অনেকগুলি স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠনকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং বন দপ্তরের সহযোগিতায় বৃক্ষ রোপণের কাজে হাত দেওয়ার জন্য গ্রামসভা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

পূর্ব কলকাতায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া এবং দীঘায় বায়ুপ্রবাহ ও বালির দ্বারা ভূমিক্ষয়ের ওপর সমীক্ষা চালানো হচ্ছে।

কলকাতার নয়টি স্থানে সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার নির্মাণের জন্য কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে টাকা দেওয়া হয়েছে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার জন্য একটি আধুনিক পশুচিকিৎসালয় তৈরির কাজ সমাপ্তির পথে। দার্জিলিঙের পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানা এবং লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

দূষণ হ্রাস এবং পরিবেশ সংরক্ষণের চাবিকাঠি হল সাধারণের সচেতনতা। আমরা পরিচ্ছন্নতর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকার ঐকান্তিকভাবে পুনঃঘোষণা করছি এবং এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য জনগণের সমর্থন কামনা করছি।

আই সি এ ৫৫৮১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
যাক, ঘরের সব মিটেছে এখন নিশ্চিন্তে বসে বইটা একটু পড়তে পারি।
ওঁ নমঃ নারায়ণায়।
আরে একি! আমার চোখের পাওয়ারটা কি আবার বেড়ে গেল নাকি? হায় ভগবান!
এই তো এক হপ্তা হল চশমা পাল্টালুম, এঃ একটা অক্ষরও নজরে আসছে না!
নাঃ, কাল একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। পড়া তো হল না, যাই ছাতে বড়ি শুকুতে দিয়েছি—
হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই—ছাতে বড়িগুলো নিয়ে কাক পক্ষিতে মহোৎসব বসিয়েছে!

ব্যস্, টেলিস্কোপ তৈরী, এবার হ্যালী দেখবো!
কাকগুলো তাড়াতে একটা লাঠি দরকার—আরে জানালার গারদ থেকে লাঠি মতন কি একটা যেন বেরিয়ে আছে!
বাঃ, চমৎকার! এতেই হবে, কোন ছেলে ছোকরা হয়তো ফেলে গেছে। এটা দেখলেই কাক ভাগবে।
যাঃ, টেলিস্কোপটা কে যেন কেড়ে নিল!
পিসিমা!
ভক্-ভক্-ভউ
কেলেঙ্কারীয়াস কাণ্ড! পিসিমা এখানে এলো কোত্থেকে? চশমার কাঁচ দুটো খুলে নিয়ে আমি যে টেলিস্কোপটা বানিয়েছি সেটা পিসিমা নির্ঘাৎ জানতে পেরেছে! তাই—। এবার একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড ঘটাবে!
মোটেই তা নয়। কারণ আমি নিজের চোখে দেখলুম পিসিমার চোখে চশমা রয়েছে!
সত্যি বলছিস, তুই পিসিমার চোখে চশমা দেখেছিস? তা চশমা এলো কোত্থেকে?
কি মুস্কিল, তোর কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?
আর পিসিমা যদি জানতে পারতো তাহলে তোকে কি এত সহজে ছেড়ে দিত? মনে হয় ওটা পুরোন কোন একটা চশমা লাগিয়েছে।
ঠিক বলেছিস! চল্ চল্ পিসিমার হাত থেকে এখুনি ওটা নিয়ে নিতে হবে।

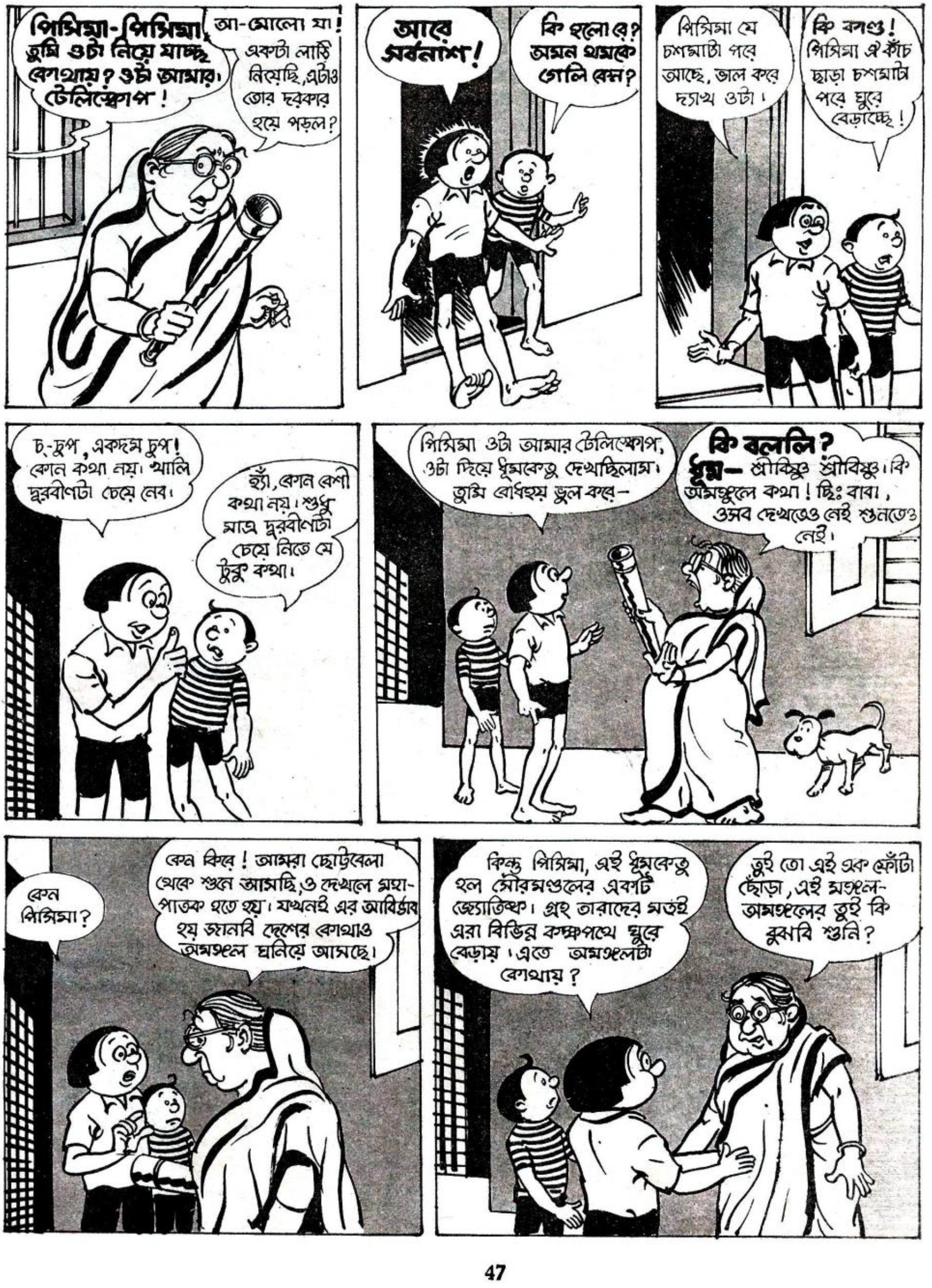
পিসিমা-পিসিমা, তুমি ওটা নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? ওটা আমার টেলিস্কোপ!
আ-মোলো যা! একটা লাঠি নিয়েছি, এটাও তোর দরকার হয়ে পড়ল?
আরে সর্বনাশ!
কি হলো রে? অমন থমকে গেলি কেন?
পিসিমা যে চশমাটা পরে আছে, ভাল করে দ্যাখ ওটা।
কি কাণ্ড! পিসিমা ঐ কাঁচ ছাড়া চশমাটা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!
চ-চুপ, একদম চুপ! কোন কথা নয়। খালি দূরবীণটা চেয়ে নেব।
হ্যাঁ, কোন বেশী কথা নয়। শুধু মাত্র দূরবীণটা চেয়ে নিতে যে টুকু কথা।
পিসিমা ওটা আমার টেলিস্কোপ, ওটা দিয়ে ধূমকেতু দেখছিলাম। তুমি বোধহয় ভুল করে—
কি বললি? ধূম— শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। কি অমঙ্গুলে কথা! ছিঃ বাবা, ওসব দেখতেও নেই শুনতেও নেই।
কেন পিসিমা?
কেন কিরে! আমরা ছোট্টবেলা থেকে শুনে আসছি, ও দেখলে মহা-পাতক হতে হয়। যখনই এর আবির্ভাব হয় জানবি দেশের কোথাও অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে।
কিন্তু পিসিমা, এই ধূমকেতু হল সৌরমণ্ডলের একটি জ্যোতিষ্ক। গ্রহ তারাদের মতই এরা বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। এতে অমঙ্গলটা কোথায়?
তুই তো এই এক ফোঁটা ছোঁড়া, এই মঙ্গল-অমঙ্গলের তুই কি বুঝবি শুনি?

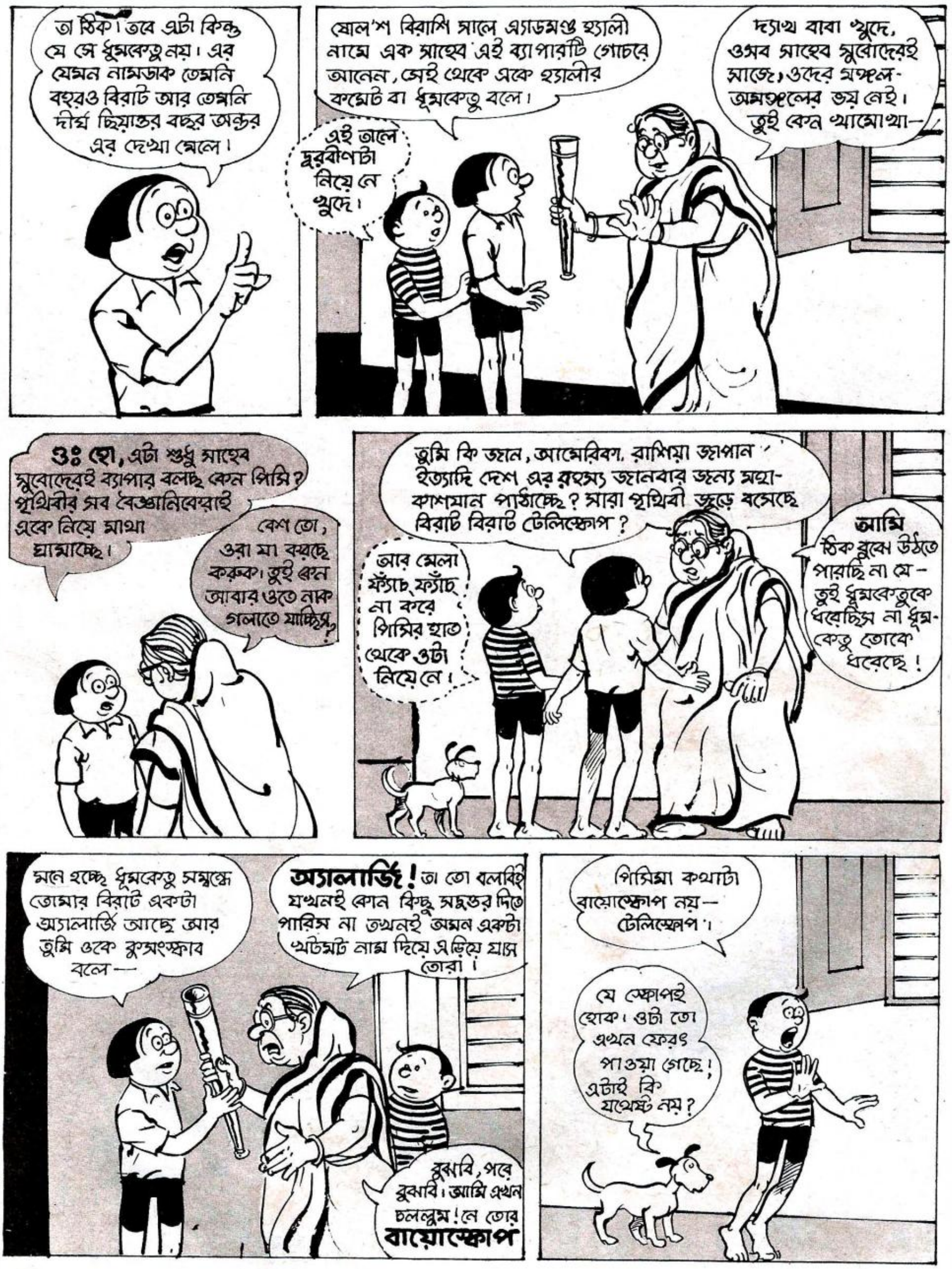
তা ঠিক। তবে এটা কিন্তু যে সে ধূমকেতু নয়। এর যেমন নামডাক তেমনি বহরও বিরাট আর তেমনি দীর্ঘ ছিয়াত্তর বছর অন্তর এর দেখা মেলে।
ষোল'শ বিরাশি সালে এ্যাডমণ্ড হ্যালী নামে এক সাহেব এই ব্যাপারটি গোচরে আনেন, সেই থেকে একে হ্যালীর কমেট বা ধূমকেতু বলে।
এই তালে দূরবীণটা নিয়ে নে খুদে।
দ্যাখ বাবা খুদে, ওসব সাহেব সুবোদেরেই সাজে, ওদের মঙ্গল-অমঙ্গলের ভয় নেই। তুই কেন খামোখা—
ওঃ হো, এটা শুধু সাহেব সুবোদেরেই ব্যাপার বলছ কেন পিসি? পৃথিবীর সব বৈজ্ঞানিকেরাই একে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।
বেশ তো, ওরা যা করছে করুক। তুই কেন আবার ওতে নাক গলাতে যাচ্ছিস?
তুমি কি জান, আমেরিকা, রাশিয়া জাপান ইত্যাদি দেশ এর রহস্য জানবার জন্য মহাকাশযান পাঠাচ্ছে? সারা পৃথিবী জুড়ে বসেছে বিরাট বিরাট টেলিস্কোপ?
আর মেলা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ না করে পিসির হাত থেকে ওটা নিয়ে নে।
আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে— তুই ধূমকেতুকে ধরেছিস না ধূমকেতু তোকে ধরেছে!
মনে হচ্ছে ধূমকেতু সম্বন্ধে তোমার বিরাট একটা অ্যালার্জি আছে আর তুমি ওকে কুসংস্কার বলে—
অ্যালার্জি! তা তো বলবিই যখনই কোন কিছু সদুত্তর দিতে পারিস না তখনই অমন একটা খটমট নাম দিয়ে এড়িয়ে যাস তোরা।
বুঝবি, পরে বুঝবি। আমি এখন চললুম! নে তোর বায়োস্কোপ
পিসিমা কথাটা বায়োস্কোপ নয়— টেলিস্কোপ।
যে স্কোপই হোক। ওটা তো এখন ফেরৎ পাওয়া গেছে! এটাই কি যথেষ্ট নয়?

পিসি সরে পড়েছে। চল, এখন তাহলে আমরা নিরাপদেই হ্যালীর কমেট পর্যবেক্ষণ করতে পারবো কি বলিস, মধু ?
কিন্তু পিসিমার অ্যালার্জি কিছুতেই দূর করা গেল না ! ধূমকেতু হল, জল মিথেন কার্বণডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন ইত্যাদি কতকগুলো পদার্থের জমাট রূপ।
ওমা একি কথা ! আমি ভেবেছিলুম ঐ রাহু-কেতু নামে অসুরদের কোন জাতভাই হবে ! তাহলে নামেই কেতু আসলে ধোঁয়া,
সূর্যের উত্তাপেই ঐ সব পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং ছুটে বেড়ানোর জন্য ঐ গ্যাস লম্বা পুচ্ছের আকার নেয়।
এটা সূর্যের যত কাছে আসে ঐ গ্যাসীয় পুচ্ছ তত বেড়ে যায়। কোন কোন ধূমকেতুর ল্যাজ নাকি হাজার লক্ষ কিলো মিটার পর্যন্ত হতে দেখা গেছে।
লেজ, অথচ কোন জন্তু জানোয়ার নয় — এ কেমন কথা ?
বলিস কি ! তাহলে তো ঐ লেজের ঝাপটায় যে কোন সময় পৃথিবী অন্ধকার করে দিতে পারে !
তা আর অসম্ভবটা কোথায় ?
আচ্ছা এই ধূমকেতু তো পৃথিবীতে আছড়ে পরতে পারে ?
অত বড় লেজ যার সে তো লেজে গোবরে হবেই সুতরাং সুতরাং আছাড় খেতেই পারে।
দূর বোকা, ওদের দেখতেই অমন বিরাট বিশাল। আসলে একেবারে হালকা।
আর পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে বিভিন্ন বায়বীয় স্তর। এই বেষ্টনী ভেদ করে তা মাটিতে পড়ার আগেই ঘর্ষণেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।
হুম-ম্!

এ বিষয়ে আমি আর বেশী জ্ঞান দেব না। কারণ ওদিকে টনক নড়লেই পিসিমা দৌড়ে আসবে এবং দূরবীণটা যাবে এবং দুর্লভ হ্যালীকেও হারাবো।
তবে কেউ যদি না বলে দেয় আর যতক্ষণ না ডাক্তারখানায় যাচ্ছে ততক্ষণ তোর ঐ যন্ত্র অটুট থাকবে।
ওকি রে খুদে, ওদিকপানে অত মনযোগ দিয়ে কি দেখছিস?
জানিস না, হ্যালীর ধূমকেতু আসছে?
দেখতে পেয়েছিস?
নাঃ, এখনও তো দেখতে পাচ্ছি না!
!
জীবনেও পাবি না!
কেন? হ্যালী কি দিক পরিবর্তন করেছে?
তোর মাথা! হ্যালী ঠিক পথেই আসছে, তুইই দিক পরিবর্তন করে বসে আছিস।
এ মাসে হ্যালীর ধূমকেতু দেখতে পাবি পূব আকাশে। আর—
ফেব্রুয়ারীর শেষে দেখতে পাবি পশ্চিম আকাশে। কাগজে পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে কত লেখালেখি হচ্ছে দেখিস না?
ভাগ্যিস, তুই বললি! তোকে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস পুঁটি
এতে আফশোসের কি আছে, পরে এটা তো আমরা টি ভিতেই দেখতে পেতুম।

তোদের ঐ দূরবীণ আমার পছন্দ নয়। আমার বায়নাকুলার আছে। তাছাড়া এখন মাঝে মধ্যে খালি চোখেও দেখা যাবে।
পিসিমা আপনি ছাতে একাকি কি করছেন?
আর বলিস না মা, বড়ি শুকুতে দিয়েছিলুম এখন এসে দেখি একটাও নেই! পাখি কাঠবেড়ালিতে সব খেয়ে গেছে। তা, তুই এখানে কি করতে পুঁটি?
আপনাদের ছাত থেকে ধূমকেতু দেখবো।
অ্যাঁঃ, তোকেও ঐ ধূমকেতুতে ভর করেছে? যত্তোসব অমঙ্গুলে কাণ্ড!
অমঙ্গলে! প্রাচীন কালে এর এই বদনাম ছিল বটে, কিন্তু এখন মানুষ চাঁদ থেকে মাটি নিয়ে আসছে, সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে তুলে আনছে কনিষ্কের ভাঙা অংশ। তাই বলছি, এতদিন বাদে হ্যালীর ধূমকেতু তার জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে আবার দেখা দেবে আর অমঙ্গলের দোহাই দিয়ে আপনি চোখ বুঝে থাকবেন?
আ-আচ্ছা পুঁটি তোকে চুপু চুপু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমাকে ওটা একবার দেখাতে পারিস? আমারও একটু কৌতূহল হচ্ছে।
এতে কিন্তুর কি আছে? আমার দূরবীণ আছে, তা আপনি তো নতুন চশমা— আরে! আপনি চোখে ওটা কি পরেছেন?
কেন? চশমা!
হিঃ-হিঃ-হিঃ, ওর কাঁচ দুটো গেল কোথায়? ওতো শুধুই ফ্রেমটা!
দেখেছ কাণ্ড! তাই তো বলি, আমার নতুন চশমা অথচ এখনই আগের চেয়েও খারাপ দেখতে শুরু করেছি! পাওয়ারটা কি হঠাৎ এত বেড়ে গেল?

তাহলে কাঁচ দুটো গেল কোথায়?
পিসিমা, আমার মনে হয় এসব ঐ খুদে বৈজ্ঞানিকের কীর্তি। ও আপনার এই কাঁচ খুলে নিয়ে ধূমকেতু দেখবে বলে টেলিস্কোপ বানিয়েছে।
মধু, ঐ হ্যালীর ধূমকেতু—
এসে গেছে!
পাজি! বজ্জাত, বাঁদর তুই ভেবেছিস কি? আমি এতই বোকা যে তোর চালাকি ধরতে পারবো না? আমার চশমার কাঁচ দিয়ে বায়োস্কোপ!
ক্-কে?
প-পিসিমা, আমি বুঝতে পারিনি যে ওটা তোমার নতুন চশমা। পুরোন ভেবেই আমি—
খবরদার, আমার সঙ্গে কোনদিন চালাকি করতে আসবি না। আচ্ছা তোদের ওটা কি দেখা যাচ্ছে?
ক্-কেন পিসিমা?
আঃ, বল শিগগির ওটা দেখা যাচ্ছে কিনা।
য-যাচ্ছে পিসিমা! ক-কে-কেন?
তোর দেখা হয়ে গেলে বায়োস্কোপটা আমাকে একবার দিবি। চশমার কাঁচ দিয়েই এটা বানিয়েছিস তো, সুতরাং ধূমকেতু দেখতে খুব একটা অসুবিধা হবে না।
তু-তুমিও হ্যালীর ধূমকেতু দেখবে পিসিমা?
পিসিমা আবার টেলিস্কোপকে বায়োস্কোপ বানিয়ে ফেললেন!
হ্যাঁ, দেখবো বইকি। তবে কাজ হয়ে গেলে চশমার কাঁচ দুটো ফেরত দিয়ে যাস বাবা।
!!
আশ্চর্য! শেষমেষ পিসিমাকেও এই ধূমকেতু ভর করলো?

ধূমকেতু-বার্তাঃ নেপথ্য কাহিনী

রমাতোষ সরকার

কোন জ্যোতিষ্ক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ মনোযোগ পেয়েছে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে? ক্যুইজ-মাস্টারের এই তাক লাগানো প্রশ্নের পয়েণ্ট-জেতা জবাব হবে— ধূমকেতু।

শুনতে অদ্ভুত লাগে কিন্তু কথাটা সত্যি যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধূমকেতু সম্পর্কিত তথ্যের ভাণ্ডার অনেকটাই পূর্ণ করেছে একেবারে সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টা। এই সব সাধারণ মানুষের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ পরে পেশাগত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়ে পড়েছেন, কিন্তু শুরুতে তা ছিলেন না। আবার অনেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ-জ্যোতির্বিজ্ঞানীই থেকে গেছেন—ক্ষীণ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে শুধু এক বা একাধিক ধূমকেতু আবিষ্কারের মাধ্যমে। এঁরা কেউ কেউ সর্বতোভাবে ধূমকেতুর সন্ধান করেছেন—রাতের পর রাত জেগে, ঘাড় ব্যথা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে। কেউ কেউ আবার তা-ও করেন নি। হঠাৎ দুম করে একটা ধূমকেতুকে দেখে ফেলেছেন, আর চেনা-শোনা মহলে তার উল্লেখ করেছেন, খোঁজ পেয়ে খতিয়ে দেখে পরে বিশেষজ্ঞরা বুঝেছেন যে সেটা ইতিপূর্বে অনাবিষ্কৃত এক নতুন ধূমকেতু। এঁদের মধ্যে চাষী আছেন, মেষপালক আছেন, জেলে আছেন, খনি-শ্রমিক আছেন—আছেন গান বাজনা শেখানোর মাস্টার, আইনজীবী, আরো কত-কি।

একথা বোধহয় অনেকেরই জানা আছে যে, সুদূর অতীতে আকাশে ধূমকেতু আবির্ভাবের অনেক বিবরণ বা উল্লেখ অতি প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে খ্রিস্টপূর্ব 240 অব্দে হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর আকাশে জমকালো রূপে দেখা দিয়েছিল, সে-সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রায় নিঃসন্দেহ; কারণ সমকালীন চীনা সাহিত্যে সে ঘটনার নির্ভরযোগ্য উল্লেখ মেলে। বিশিষ্ট এই ধূমকেতুটির আরও পূর্ববর্তী একাধিক আবির্ভাব সম্পর্কেও সম্ভাব্য কিছু কিছু ইঙ্গিত পূর্বতন সাহিত্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে। প্রাচীনতম যেটি, তার সন হবে 1057 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অন্য আরও কিছু ধূমকেতু সম্পর্কেও এমন বেশ কিছু সুপ্রাচীন নজির আছে। আর যত পরবর্তীকালের দিকে এগিয়ে আসা যায়, ততই উল্লেখ হয় বহুতর এবং বৃহত্তর।

প্রাচীন উল্লেখ সম্পর্কে একটা ব্যাপার চোখে পড়ার মত এবং কিছুটা বিস্ময়করও বটে। উল্লেখগুলো প্রায় কোন ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান-আলোচনা প্রসঙ্গে আসে নি—এসেছে অন্য প্রসঙ্গে। এ থেকে বেশ বোঝা যায়, ঘটনাগুলো সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ দাগ ফেলেছিল। সাধারণ মানুষ মনোযোগ দিয়ে ধূমকেতুদের লক্ষ্য করতেন—তাদের আকার-আকৃতি বা আবির্ভাবের স্থান-কালের হিসাব রাখতেন, তা সে কৌতূহলের বশেই হোক বা কুসংস্কারের চাপেই হোক।

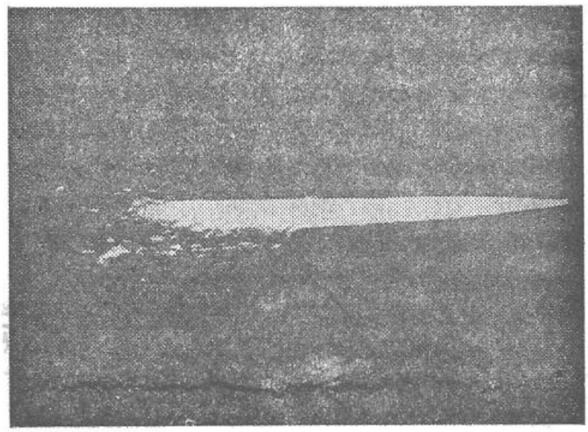

অতিকায় পুচ্ছ

এবারে হ্যালির ধূমকেতু যখন সূর্যের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে তখন তার পুচ্ছের দৈর্ঘ্য হয়ে দাঁড়াবে প্রায় আট কোটি কিলোমিটার। কিন্তু আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ধূমকেতুর সর্ববৃহৎ পুচ্ছের দৈর্ঘ্যের তুলনায় এটা কিছুই না। 1843 সালে যে ধূমকেতুটিকে দেখা যায় তার পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় আশি কোটি কিলোমিটার। অর্থাৎ সূর্য থেকে বৃহস্পতির যা দূরত্ব তার চেয়েও বেশী।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পরপর তিনজন কৃতী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ধূমকেতুর ব্যাপারে কম-বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। এঁরা হলেন ডেনমার্কের টাইকো ব্রাহি, জার্মানীর যোহানেস কেপলার আর ইংল্যাণ্ডের এডমণ্ড হ্যালি। এঁদের মধ্যে হ্যালির কৃতিত্বটাই সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি পায়। তাঁর নামে একটি ধূমকেতুর নাম দেওয়া

হয় 'হ্যালির ধূমকেতু', যে ধূমকেতুটিকে ঘিরে মুখ্যত তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়েছিলেন। আর ধূমকেতুর সঙ্গে নামের এই সংযুক্তি হ্যালিকে খ্যাতির শীর্ষে স্থাপিত করে।

হ্যালির জীবনের এই ঘটনার ফলশ্রুতি ধূমকেতুদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহকে বহুগুণ বর্ধিত করল, যুক্ত করল এক নতুন ধারা। ধূমকেতু আবিষ্কার করে বিখ্যাত হওয়া, মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকা— এ-বাসনা বহুতর সাধারণ মানুষকে নেশার মত পেয়ে বসল। শুরু হয়ে গেল তীব্র প্রতিযোগিতা, আর সে প্রতিযোগিতা আজও অব্যাহত। আজও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা শ্রেণীর সাধারণ মানুষ ছোটখাট দূরবীন—অনেক ক্ষেত্রে স্বনির্মিত দূরবীন—নিয়ে আকাশ তোলপাড় করে চলেছে। উদ্দেশ্য নতুন কোন ধূমকেতুকে প্রথম লক্ষ্য করা। আশা সে ধূমকেতুর সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে পারা আর সেই সূত্রে স্থায়ীভাবে ইতিহাস-পৃষ্ঠায় স্থান করে নেওয়া।

আবিষ্কারকের নাম কতটা প্রচার লাভ করবে সেটা অবশ্যই নির্ভর করে আবিষ্কৃত ধূমকেতুর আকার, আকৃতি, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উপর। সাম্প্রতিককালের বেশ বড় রকমের সাফল্যজয়ী দুজন মানুষ হলেন জাপানের কাওরু ইকেয়া (Kaoru Ikeya) এবং সুতোমু সেকি (Tsutomu Seki)। দ্বিতীয় জন পেশায় গীটারবাদক। বছর দশেক কৃচ্ছ্রসাধন করে একটা ভাল বাইনোকিউলার কিনতে পেরেছিলেন। হাল্কা এই যন্ত্রটির সাহায্যে তাড়াতাড়ি আকাশের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়ে কিছুক্ষণ বাদে বাদে একবার চোখ বুলিয়ে নিতেন। আর ছিল এক বন্ধুর হাতে গড়া এক দূরবীন, যার সাহায্যে আশাব্যঞ্জক কিছু চোখে পড়লে আরও ভালভাবে দেখা এবং প্রয়োজনে ছবি তোলার ব্যবস্থা করতেন। আর প্রথম জন? তাঁর শিক্ষাদীক্ষা এবং আর্থিক অবস্থা ছিল আরও নিম্নমানের। বাবা এক সময় ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পরে প্রচুর লোকসান দিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেন। সংসারের দায়দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না, দুঃখে-লজ্জায় নিজেকে নেশায় ডুবিয়ে রাখতেন। মা অনন্যোপায় হয়ে এক হোটেলে পরিচারিকার কাজ নেন। এই অবস্থায় তীব্র আত্মসম্মান বোধ-সম্পন্ন অথচ সহায়সম্বলহীন কিশোর ইকেয়া সংকল্প করেন আত্মীয় বন্ধুমহলে তাঁর নিজের বা পরিবারের এক অন্য পরিচয় তুলে ধরবেনই। ইকেয়া বেছে নেন ধূমকেতু খোঁজার পথ। এ-পথ অনিশ্চয়তার পথ, এ-পথ প্রায়শ

মঞ্জুষা শোরুম : লিন্ডসে স্ট্রীট * লেকমার্কেট * দমদম এয়ারপোর্ট * সি-আই-টি সুপারমার্কেট-ঢাকুরিয়া * হাওড়া সাবওয়ে * দার্জিলিঙ * হলদিয়া * বারুইপুর * সিউড়ি * কৃষ্ণনগর * বোলপুর * বর্ধমান * দিল্লী * মাদ্রাজ * বাঙ্গালোর * জয়পুর

প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং ধৈর্য দাবি করে কিন্তু এ-পথ বিশেষ অর্থ সামর্থ্য দাবি করে না। তাই এটাই ছিল ইকেয়ার পথ। ইকেয়ার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। 1963 সালে হাতেগড়া এক দূরবীনের সাহায্যে তিনি একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। খবরের কাগজ, রেডিও-টেলিভিশনের লোকেরা ওঁর কাছে ছুটে আসে—কিছুটা সম্মান বা খ্যাতি তিনি লাভ করেন। আরও পরে বৃহত্তর খ্যাতি অর্জন করেছেন ইকেয়া—সেকি-ধূমকেতু আবিষ্কার করে। 1965 সালের শেষার্ধে সে-ধূমকেতুটিকে কলকাতাসহ পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকে খালি চোখেই দেখা গেছল। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কি চমকপ্রদ তার রূপ।

ইকেয়ার সঙ্গে সেকির নাম যুক্ত হয়েছে এই কারণে যে সেকি ধূমকেতুটির যুগ্ম-আবিষ্কর্তা বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এমন অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি একই সঙ্গে একাধিক অনুসন্ধানকারীর মিলিত প্রচেষ্টায় ধূমকেতুটি প্রথম পরিদৃষ্ট হয় বা স্বতন্ত্রভাবে একাধিক ব্যক্তি ধূমকেতুটিকে আবিষ্কার করেন একই সময়ে বা অল্প সময়ের আগে-পরে কিন্তু অবশ্যই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে তাহলে ঐ একাধিক ব্যক্তির নাম ধূমকেতুটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। নামের ক্রম নির্ধারিত হয় আবিষ্কার-কালের অল্প ব্যবধানের ক্রমানুযায়ী বা কৃতিত্বের পরিমাপ অনুসারে। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত এই নাম স্থিরীকরণের ব্যাপারে কিছুটা অব্যবস্থা ছিল, ফলে কিছু বাদ-বিসংবাদ হয়তো বা অবিচারও ঘটতো। আজকাল অবশ্য আর তেমন হওয়ার আশঙ্কা বিশেষ নেই। সমস্ত ব্যাপারটা এখন নিয়ন্ত্রণ করেন এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা—'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন' বা সংক্ষেপে 'আই এ ইউ' (IAU)। গত নভেম্বর মাসে এই সংস্থার 19-তম অধিবেশন দিল্লীতে হয়ে গেল। এশিয়ার কোন দেশে অধিবেশন হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। এঁদের তত্ত্বাবধানে আমেরিকায় যে প্রতিষ্ঠানটি ধূমকেতুঘটিত দাবিদাওয়ার ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখেন তাঁদের নাম ঠিকানা হলঃ **Central Bureau for Astronomical Telegrams, Harvard-Smitasonian center for Astrophysics, 60 Garden Sheet, Cambridge, Massachusetts 02138, U.S.A.**। এখন নতুন ধূমকেতু—আবিষ্কর্তাকে কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেতে খুব একটা ঝামেলায় পড়তে হয় না। এখন তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে নতুন ধূমকেতু বলে ধারণা হলেই দৃষ্ট বস্তুটিকে আরও এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া—তিনি বা তাঁরা যত পরিমাণে স্বার্থ-শূন্য এবং দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হন, ততই ভাল। এমন দর্শকের সাক্ষ্য পরে দাখিল করতে হতে পারে। দ্বিতীয় কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উল্লিখিত ঠিকানায় এক তারবার্তা পাঠানো। ব্যয় সংক্ষেপ করতে তারবার্তা সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে তার পরিপূরক হিসাবে অবশ্যই এক যথোচিত দীর্ঘ পত্রও পাঠাতে হয়। তারবার্তা পাঠানোর সময়টা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করাতে হয়। কারণ বেশ কয়েকটা তারবার্তা বিচারকমণ্ডলীর হাতে পেঁছিতে পারে, তখন পেঁছানোর সময়ের চেয়ে পাঠানোর সময়টাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বিচারকমণ্ডলী দাবির যাথার্থ্য এবং পূর্বগামিতার ভিত্তিতে নব-আবিষ্কৃত ধূমকেতুর নাম ঠিক করেন। একাধিক নাম যুক্ত করতে হলে ওঁরা প্রয়োজনমত ঝাড়াই-বাছাই করেন বা বিশেষ বিবেচনা ক্ষমতার প্রয়োগ

হ্যালির ধূমকেতু
কবে কখন দেখা যাবে

ডিসেম্বর 1985

সূর্যাস্তের পর দক্ষিণ আকাশে ধূমকেতুটিকে দেখা যাবে মীনরাশিতে অস্পষ্ট আলোর বিন্দুর মত। আকাশ খুবই পরিষ্কার না থাকলে শুধু চোখে দেখা সম্ভব না'ও হতে পারে। মাসের দ্বিতীয়ার্ধে চাঁদের আলোয় ধূমকেতুটি হারিয়ে যাবে।

জানুয়ারি 1986

সূর্যাস্তের পর দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে মাত্র ঘণ্টা দু'একের জন্য একে দেখা যাবে কুম্ভরাশিতে। মাসের মাঝামাঝি ধূমকেতুকে বৃহস্পতি গ্রহের খুবই কাছে দেখা যাবে। এবারেও মাসের দ্বিতীয়ার্ধে চাঁদের আলো পর্যবেক্ষণে বাধা দেবে।

ফেব্রুয়ারি 1986

প্রায় পুরো মাসটাই ধূমকেতুটি সূর্যের খুবই কাছে থাকার দরুন তাঁর আলোয় হারিয়ে যাবে। মাসের শেষের দিকে তাকে দেখা যাবে ভোরের আকাশে।

মার্চ 1986

সূর্যোদয়ের ঠিক আগে ধূমকেতুটিকে দেখা যাবে মকর ও ধনুরাশির মাঝখানে। মাসের প্রথম ও শেষ সপ্তাহে চাঁদের আলোয় ধূমকেতুটিকে দেখা যাবে না।

এপ্রিল 1986

ভোরের আকাশে ধূমকেতুটিকে দেখা যাবে দক্ষিণ-পূর্বে। বৃশ্চিক রাশিতে। এ সময় হ্যালি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকার দরুন খুব উজ্জ্বল দেখাবে। এর পুচ্ছের দৈর্ঘ্যও বেশী হবে। এটা হলো হ্যালিকে দেখার সবচেয়ে ভাল সময়। মাসের শেষ দশদিন চাঁদের আলোয় একে দেখা নাও যেতে পারে। অবশ্য 24শে পূর্ণিমার দিন চন্দ্র গ্রহণের সময় পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকা থেকে একে পরিষ্কার দেখা যাবে হস্তা তারামণ্ডলের পশ্চিমে।

করেন। একটি ধূমকেতুর সঙ্গে তিনের বেশি নাম যুক্ত করার রেওয়াজ নেই। কিন্তু তাতেও কখনও কখনও নাম বেয়াড়া রকমের বড় হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত—চুরিউমভ—জেরাসিমেঙ্কো (Churyumov—Gerasimenko), টাটল—জিয়াকোবিনি ক্রে সা ক (Tuttle—Giacobini-Kresak), হন্ডা মারকস—পাজদুসাকোভা (Honda Markos—Pajdusakova) ইত্যাদি। এমন নামের অনুমোদন দিলে নিশ্চয় আবিষ্কর্তাদের যথাসম্ভব দিলখুশ রাখা যায় কিন্তু যাঁরা পরে ঐ-সব ধূমকেতুদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন তাঁদের মুখ-ব্যথা করে।

ধূমকেতু আবিষ্কার করে শুধু নাম নয়, কেউ কেউ বেশ পয়সাও করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটাই ছিল প্রধান উদ্দীপক। এমন ঘটনাগুলো অবশ্য সবই ঘটেছে ধনী এবং খেয়ালী দেশ আমেরিকায়। 1881 সালে সেখানকার এক দেশভক্ত ধনকুবের এইচ এইচ ওয়ারনার (H. H. Warner) ঘোষণা করেন যে, উত্তর আমেরিকা থেকে যে-কেউ নতুন কোন ধূমকেতু আবিষ্কার করবেন তাঁকেই নগদ 200 ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কারের ঘোষণা বছর দশেক বলবৎ ছিল এবং সেই সুযোগের যাঁরা বিশেষ সদ্ব্যবহার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন ব্রুকস (Brooks), বার্নার্ড (Barnard), ও অন্যান্য। বার্নার্ড পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়ে দাঁড়ান ; বৃহস্পতি গ্রহের একটি উপগ্রহ আবিষ্কার, অনুজ্জ্বল নীহারিকা সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয় বিষয়টিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তোলেন। অফিউক্লাস (ophiuclus) মণ্ডলে অবস্থিত আকাশের অস্থিরতম তারাটির নাম বার্নার্ডের তারা (Barnard's star)। কারণ এই তারাটির বৈশিষ্ট্য উনিই আবিষ্কার করেন। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান ছিল ওঁর শখ মাত্র। পেশা ছিল ফটো নেওয়া। তাতে বিশেষ অর্থাগম হত না। দরিদ্র বার্নার্ডের তাই অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং ধূমকেতু আবিষ্কারের সূত্রে পাওয়া অর্থ পুরস্কার ওঁর খুব কাজে লেগেছিল। উনি ধূমকেতু মাধ্যমে লব্ধ টাকায় একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'যে-বাড়ি ধূমকেতুর দ্বারা নির্মিত' (The house that was built with comets)। তাছাড়া, ওঁর আত্মজীবনীতে উনি এক জায়গায় লিখেছেন যে, একবার পাওনাদারের ভয়ে ওঁকে ধূমকেতু সন্ধানের প্রচেষ্টাকে বিশেষ জোরদার করতে হয় আর তাতেই তাঁর মানরক্ষা হয়। এক নতুন ধূমকেতু তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, পুরস্কারের টাকা হাতে আসে আর প্রায় সেই সঙ্গেই আসে পাওনাদারের স্মারকপত্র।

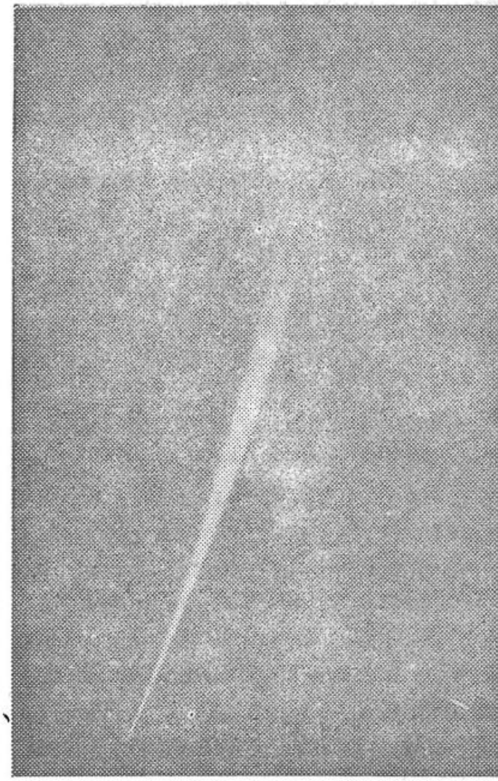

ধূমকেতু ইয়েকো সাকি—1965

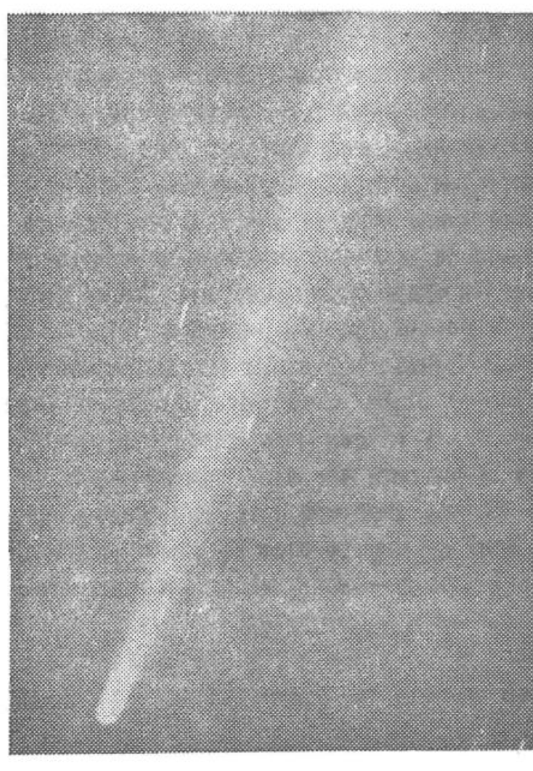

কোহুটেক ধূমকেতু—1973

কোষ দিনোজ কুমার দে

প্রঃ উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের প্রাথমিক কোষপ্রাচীর, মধ্যচ্ছদা ও গৌণ কোষপ্রাচীরের মধ্যে সর্বপ্রথম কোনটি গঠিত হয় ?

উঃ মধ্যচ্ছদা।

প্রঃ প্রাণিকোষের কোষ আবরণী কি কি দ্বারা গঠিত ?

উঃ প্রোটিন ও লিপিড।

প্রঃ রবার্টসনের একক আবরণী (unit membrane) কি ?

উঃ প্রতিটি কোষ আবরণী প্রোটিন—লিপিড—প্রোটিন এইরূপ তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানী রবার্টসনের মতে সকল সজীব আবরণীর বিন্যাসই এইরূপ। তাই এই ত্রিস্তরযুক্ত স্তরকে বলা হয় একক আবরণী।

প্রঃ মাইক্রোভিলাই কাহাকে বলে ?

উঃ কখনও কখনও কোষ পর্দার বাহিরের দিকে আঙ্গুলের মত প্রসারিত অংশ দেখা যায়। এই আঙ্গুলের মত প্রসারিত অংশগুলিকে বলা হয় মাইক্রোভিলাই।

প্রঃ একটি দ্বি-নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রাণিকোষের উদাহরণ দাও।

উঃ প্রাণীর যকৃত কোষ।

প্রঃ সিনসিটিয়াল কোষ এবং সিনোসাইটস্-এর মধ্যে প্রভেদ কি ?

উঃ বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রাণিকোষকে বলা হয় সিনসিটিয়াল কোষ এবং বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত উদ্ভিদ কোষকে বলা হয় সিনোসাইটস্।

প্রঃ যে লিউকোপ্লাসটিডে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন সঞ্চিত থাকে তাহাকে কি বলে ?

উঃ অ্যালুউরোপ্লাস্ট।

প্রঃ প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল্ কি ?

উঃ অনেক সময় উদ্ভিদ কোষের ছোট ছোট গহ্বরগুলি যুক্ত হইয়া একটি বড় গহ্বরে রূপান্তরিত হয়। তখন কোষ মধ্যস্থ সাইটোপ্লাজম কোষ প্রাচীরের কাছাকাছি একটি পাতলা স্তরের মত অবস্থান করে। কোষ প্রাচীর সংলগ্ন এই সাইটোপ্লাজমের স্তরকে বলা হয় প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল্।

প্রঃ ক্রোমোজোমের নামকরণ করেন কে ?

উঃ বিজ্ঞানী ওয়ালডেয়ার।

প্রঃ পেলিকল্ কি ?

উঃ ক্রোমোজোমের বাহিরের আবরণকে বলা হয় পেলিকল্।

প্রঃ পলিসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম কাহাকে বলে ?

উঃ একাধিক সেণ্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোজোমকে বলা হয় পলিসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম।

প্রঃ স্যাটিলাইট কি ?

উঃ গৌণ খাঁজযুক্ত ক্রোমোজোমের গৌণ খাঁজের পরবর্তী ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় স্যাটিলাইট।

প্রঃ লিথ্যাল জিন কাহাকে বলে ?

উঃ গামা রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট ও রঞ্জন রশ্মি দ্বারা পরিবর্তিত মিউট্যাণ্ট জিনগুলি অনেক সময় প্রচণ্ড ক্ষতিকারক হইয়া থাকে। এই ক্ষতিকারক মিউট্যাণ্ট জিনগুলিকে বলা হয় লিথ্যাল জিন।

প্রঃ ক্রোমোজোম পাফ কাহাকে বলে ?

উঃ পলিটিন ক্রোমোজোমের ডার্কব্যাণ্ডের অন্তর্গত ফোলা অংশকে বলা হয় ক্রোমোজোম পাফ।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির চারটি করিয়া সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর।

(ii) নিউক্লিয়াস আবিষ্কৃত হয়—

(a) 1813 খৃস্টাব্দে (b) 1318 খৃস্টাব্দে (c) 1831 খৃস্টাব্দে (d) 1138 খৃস্টাব্দে।

(ii) আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবকোষে থাকে

(a) থাইলাকয়েড (b) লাইসোজোম (c) ক্লোরোপ্লাস্ট (d) মাইটোকনড্রিয়া।

(iii) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দুইটি কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমীয় সহযোগ রক্ষা করে—(a) ক্রোমোনিমাটর (b) প্লাজমোডেসমাটা (c) মাইকোপ্লাজমা (d) পলিজোম।

(iv) সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রকে বলা হয়—

(a) প্রোটোপ্লাজম (b) ট্রোফোপ্লাজম (c) টোনোপ্লাজম (d) হায়ালোপ্লাজম।

(v) একাধিক রাইবোজোম পরস্পর যুক্ত হইয়া সৃষ্টি করে—

(a) রাইবোজোম (b) লাইসোজোম (c) মেসোজোম (d) পলিজোম।

(vi) মাইটোকনড্রিয়া—

(a) এক পর্দা পরিবৃত (b) দ্বি-পর্দা পরিবৃত (c) ত্রি-পর্দা পরিবৃত (d) পর্দা পরিবৃত নয়।

(vii) কোনটি ঠিক নয়—

(a) গলগি বস্তু নিউরোসিক্রিসনে অংশ গ্রহণ করে।

(b) লাইসোজোম কোষের বিভাজনে প্রেরণা জোগায়।

(c) সেণ্ট্রোজোমের সেণ্ট্রিওল দুটি পরস্পর 90° কোণে অবস্থান করে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

● বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।

● পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।

● রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।

● প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।

● অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

● এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

গ্রাহকদের জন্য

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 3·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 35·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।

● গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।

● M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

বৈশাখ মাস থেকে নতুন গ্রাহক করা হয়।

প্রচার সম্পাদক ঃ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

(d) আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে মাইটোকনড্রিয়া থাকে।

(viii) কোনটি ঠিক ঃ —

(a) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা গাত্র দানাযুক্ত ও মসৃণ হয় না।

(b) গলগিবস্তুর গাত্র সর্বক্ষেত্রেই মসৃণ হয় না।

(c) উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোষেই পেরক্সিজোম দেখা যায়।

(d) কেবলমাত্র উদ্ভিদ কোষে পেরক্সিজোম দেখা যায়।

(ix) গ্লাই অক্সিজোম

(a) ফ্যাটি এ্যাসিড বিপাকে অংশ গ্রহণ করে।

(b) অ্যামিনো এ্যাসিড বিপাকে অংশ গ্রহণ করে।

(c) গ্লাইসিন বিপাকে অংশ গ্রহণ করে।

(d) গ্লুকোজ বিপাকে অংশ গ্রহণ করে।

(x) হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমকে বলা হয়—

(a) জিন

(b) জিনোম

(c) জেনেটিক্স

(d) জনু।

উত্তরমালা ঃ—(i) c, (ii) a, (iii) b, (iv) d, (v) d, (vi) b, (vii) d, (viii) d, (ix) a, (x) b.

আগামী সংখ্যায়

1986 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য জীবন-বিজ্ঞান, গণিত ও ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ও প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যতথ্য নিয়ে আলোচনা করবেন—

অমরনাথ রায়, অজয় চক্রবর্তী, দিনোজ কুমার দে, সুধাংশু পাত্র ও অসীম কুমার মুখোপাধ্যায়।

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতু সম্বন্ধে কতোটা জ্ঞান ?

বিবেক রায়

রাসায়নিক দ্রব্য

1 ব্লিচিং পাউডার সম্পর্কে নিচের কোন্ উক্তিটি সত্য নয় ?

(ক) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয় (খ) সংক্রামক রোগের জীবাণুনাশক (গ) কাগজ ও সুতা বিরঞ্জনে ব্যবহৃত হয়।

উঃ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

2. ওয়াটার গ্যাসের রাসায়নিক নাম ও সংকেত কি ?

উঃ সোডিয়াম সিলিকেট, Na_2SiO_3

3 মাটির বাসনের উপর গ্লেজিং বা চিক্কনের জন্যে ব্যবহৃত হয় কোনটি ?

(ক) সোডিয়াম কার্বনেট (খ) সোডিয়াম ক্লোরাইড (গ) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড।

উঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড।

4 "রেক্টিফায়েড স্পিরিট" হলো—% ইথাইল অ্যালকোহল এবং বাকিটা জল"।—উপরের উক্তিটির শূন্যস্থান পূরণ কর। উঃ 95%।

5 মেথিলেটেড স্পিরিট তৈরি করার জন্যে রেকটিফায়েড স্পিরিটে কি কি দ্রব্য মেশানো হয় ?

উঃ পিরিডিন, ন্যাপথা ও মিথাইল অ্যালকোহল।

6. পেট্রোলিয়ামকে 105°C থেকে 300°C উষ্ণতায় আংশিক পাতিত করলে যে পাতিত অংশ পাওয়া যায়, তার নাম কি ? উঃ কেরোসিন।

7. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

—সালফেট একটি উত্তম নাইট্রোজেন ঘটিত সার।

উঃ অ্যামোনিয়াম।

8. নিচের কোন্‌টি উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন জৈব অ্যাসিড ?

(ক) ফরমিক অ্যাসিড (খ) অকজ্যালিক অ্যাসিড (গ) ওলেইক অ্যাসিড। উঃ ওলেইক অ্যাসিড।

9. নিচের উক্তিটি সম্বন্ধে যেটি প্রযোজ্য নয় সেটি কেটে দাও।

"সাবান একাধিক অ্যাসিডের লবণের মিশ্রণ হিসাবে থাকে বলে এর কোন নির্দিষ্ট সংকেত নাই / আছে।

উঃ আছে শব্দটি কেটে দাও।

10. তড়িৎ মুদ্রণে, কীটনাশক ও জীবাণুনাশক ওষুধ প্রস্তুতিতে, রঙ শিল্পে এবং কাঠ সংরক্ষণে নিচের কোন্‌টি ব্যবহৃত হয়।

(ক) কপার সালফেট (খ ব্লিচিং পাউডার (গ) ক্যালসিয়াম অক্সাইড। উঃ কপার সালফেট।

11. সাদা রঙের অনিয়তাকার কোন্ কঠিন অজৈব পদার্থকে জলে ফেললে হিস হিস শব্দ করে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়, পদার্থটি জলে ফেঁপে ওঠে এবং একটু পরেই ভেঙ্গে সাদা গুঁড়োয় পরিণত হয় ?

উঃ ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO)

12. সোডিয়াম কার্বনেটের একটি অণুতে ক'টি কেলাস জল অণু থাকে ?

(ক) 8টি (খ) 10টি গ) 12টি। উঃ 10টি।

13. ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম ও সংকেত কি ?

উঃ ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট, Ca(OCl)

14. সোডিয়াম ঘটিত এমন একটি যৌগের নাম বল যেটি তীব্র জলাকর্ষী পদার্থ, তীব্র ক্ষার, তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ আয়নিত হয়।

উঃ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH)।

ধাতু

1. ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে শিলা বা পাথররূপে কঠিন অবস্থায় প্রকৃতিজাত যে সব ধাতব যৌগ পাওয়া যায় তাদের নাম কি ? উঃ খনিজ দ্রব্য।

2. যে সব খনিজ থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ও কম ব্যয়ে ধাতু উৎপাদন করা যায় তাদের কি নামে অভিহিত করা হয় ? উঃ ধাতুর আকরিক।

3. কোন্ আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা হয় ?

(ক) ডলোমাইট (খ) বক্সাইট (গ) উইলেমাইট

উঃ বক্সাইট।

4. গ্যালভ্যানাইজেশন প্রক্রিয়ায় লোহার মরিচা নিবারণের জন্যে লোহার উপর কোন্ ধাতুর প্রলেপ লাগানো হয় ? (ক) টিন খ) ম্যাগনেসিয়াম (গ জিংক

উঃ জিংক।

5. কোনটি ঠিক ?
জার্মান সিলভার হলো—

(ক) জার্মানীতে প্রাপ্ত রূপা (খ) এক বিশেষ ধরনের রূপা (গ) একটি সংকর ধাতু।

উঃ একটি সংকর ধাতু।

6. ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর প্রধান উৎসের নাম ও সংকেত কি ?

উঃ কার্নালাইট, $KCl.\ MgCl_2\ 6H_2O$

7. এমন একটি ধাতুর নাম বল যেটি বায়ুতে দগ্ধ করলে উজ্জ্বল শিখাসহ জ্বলে, যার চূর্ণ ফুটন্ত জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে ; ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়ায় করে না, ফটোগ্রাফির ফ্লাশ বাল্ব তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

উঃ ম্যাগনেসিয়াম

8. 'রেড হিমাটাইট' কোন্ ধাতুর আকরিক ? এর সংকেত কি ?

উঃ আয়রনের আকরিক, আণবিক সংকেত Fe_2O_3

9. লোহিত তপ্ত আয়রনের উপর দিয়ে স্টীম পরিচালনা করলে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয় ?

উঃ ট্রাই ফেরাস টেট্রক্সাইড (Fe_3O_4) এবং হাইড্রোজেন গ্যাস।

10. নিচের উক্তিটির ভুল সংশোধন কর ঃ

"ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তুলার ন্যায় সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করে ঘনীভূত হয়। একে 'দার্শনিকের উল' বলে।

উঃ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের পরিবর্তে লিখতে হবে 'জিংক অক্সাইড'।

11. 'সিডারাইট' নিচের কোন্ ধাতুর খনিজ ?

(ক) জিংক (খ) অ্যালুমিনিয়াম গ) আয়রন

উঃ আয়রন।

12. কাঁসা বা বেল মেটাল-এ কোন্ কোন্ ধাতু কি কি পরিমাণ আছে ?

উঃ তামা ঃ 60—80%
টিন ঃ 40—20%

13. নিচের শূন্যস্থান সঠিকভাবে পূরণ কর ঃ

"— স্টীলে, ইস্পাতের সঙ্গে ক্রোমিয়াম মেশানো থাকে।"

উঃ স্টেইনলেস

14. 80% কপার এবং 20% জিংক সমন্বিত কোন্ সংকর ধাতু গৃহস্থালীর বাসনপত্র, মূর্তি ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় ?

(ক) ব্রাস বা পিতল (খ) ম্যাগনেলিয়াম (গ) ব্রোঞ্জ

উঃ পিতল।

কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এই সুজলা সুফলা পৃথিবীর ? প্রথম প্রাণের বিকাশই বা কবে ঘটেছিল পৃথিবীর বুকে ? এ সব প্রশ্ন শুধু ছোটদেরই নয়, বয়স্ক পাঠকেরও কৌতূহলের বিষয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস সমৃদ্ধ এক আশ্চর্য বই !

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

ছোটদের বিশ্বকোষ

১ম হইতে ষষ্ঠ খণ্ড

১ম—৩৫ টাঃ ; ২য়—২৫ টাঃ ;
৩য়—৩০ টাঃ ; ৪র্থ—৩৫ টাঃ ;
৫ম—২৫ টাঃ

ষষ্ঠ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

★ ★ ★

ছবি, ছড়া ও গল্প

উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
বাদশা ও বীরবলের গল্প ৭·৫০

সুকুমার ঘোষ
ডল পুতুলের সন্ধানে ১২·০০

শ্রীজ্ঞানাচার্য শর্মা
কশাকদের রূপকথা ১২·০০

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন
মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় ● জয়ন্ত দত্ত

অক্টোবর-নভেম্বর '85 এর আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য যে পাঁচজন সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. সন্দীপ কুমার মাইতি, 2A, আশু বিশ্বাস রোড, কলকাতা-700 025।
2. রঞ্জিতা দত্ত, প্রযত্নে, গৌরবমোহন দত্ত, অনন্তপুর, হাওড়া।
3. শান্তনু রায়, প্রযত্নে, অমরাদিত্য রায়, "রাণীভবন" কনকপুর, পাঁশকুড়া R. S, মেদিনীপুর।
4. জয়ন্ত কুমার নন্দী, সাইতাড়া, পোঃ কে. সাধুয়াডাল, বাঁকুড়া।
5. টি. চক্রবর্তী, প্রযত্নে, শম্ভুনাথ দাস (কবিরাজ), কুতুবপুর (নয়াগ্রাম), মালদা, পিন কোড-732101 মালদা।

আই-কিউ-টেস্ট Oct.-Nov. '85-এর সমাধান

উত্তর—1. 125 2. 5 3. SNOP 4. 180° 5. কয়লা

অক্টোবর-নভেম্বর '85 সংখ্যার ক্যুইজ-কনটেস্টের সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেনি। আগে আসার ভিত্তিতে দশ বা তার বেশি প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা ঃ মৌসুমী পাল, নির্মল পাল, সুজিত পোদ্দার, নিবেদিতা কর।
24-পরগনা ঃ নির্মল আচার্য, শুচিস্মিতা ঘোষ, অজয় চক্রবর্তী, সুব্রত ধাড়া, মিহির কুণ্ডু।
হাওড়া ঃ মঞ্জু দে, গৌতম দাস, গৌতম মুখার্জী।
হুগলী ঃ শ্যামলী ঘটক, শুভশ্রী ভট্টাচার্য্য, দীপনারায়ণ দত্ত।
বর্ধমান ঃ হেমেন্দ্র মণ্ডল, নিলয় হাজরা, আমিনুর রহমান।
মেদিনীপুর ঃ বিশ্বরূপ চ্যাটার্জী, নির্মলা হাজরা।
মুর্শিদাবাদ ঃ ছন্দা করণ্ডী, রেবতী দাসগুপ্ত।
বীরভূম ঃ চিরঞ্জীব দাস।
বাঁকুড়া ঃ রাজীব মুখার্জী, ইন্দ্রাণী সেন।
মালদহ ঃ বিমল মান্না, দেবজ্যোতি ঘোষ।

ক্যুইজ কনটেস্ট অক্টোবর-নভেম্বর ঃ '85 (6) এর সমাধান

1. কর্ণাটক। 2. JERICHO, দশ হাজার বছরের প্রাচীন নগর। 3. কেরালা রাজ্যের ALEPPY. 4. সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। 5. TRIGVE LIE। 6. 1960 সালে অনুষ্ঠিত রোম ওলিম্পিকে। 7. Our American Cousin. 8. SQUASH. 9. বেগ। 10. জল। 11. ক্রুপ্‌স দেমাগ কোম্পানী 12. পাপিন (PAPIN)-এর DIGESTER.

ইলেকট্রনিক পাহারাদার

শৌভিক চক্রবর্তী

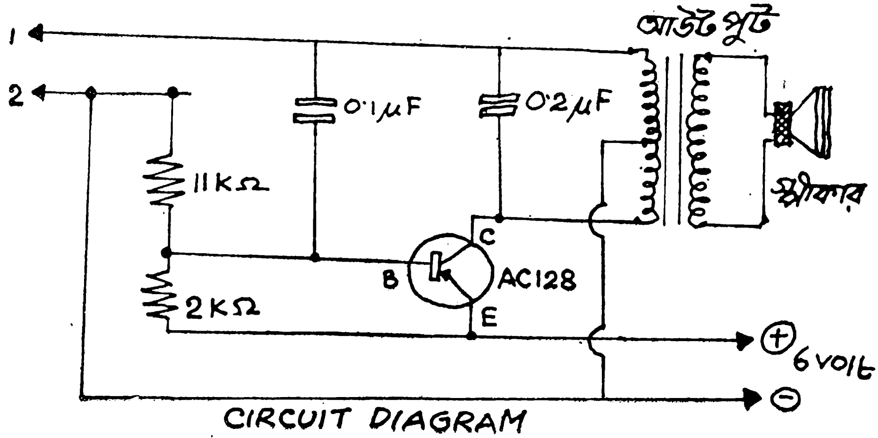

আজ তোমাদের একটি বিশেষ ধরনের মডেল তৈরি করা শিখিয়ে দেব যার সাহায্যে তোমাদের বাড়িতে চোর ঢুকে দরজা খুললেই জানতে পারবে। মডেলটির নাম 'ইলেকট্রনিক পাহারাদার'।

এই মডেলটি তৈরি করতে যা যা লাগবে তা হল ঃ—

1. ট্রান্সফরমার ঃ—আউট পুট একটি।
2. ট্রানজিস্টার *—AC 128 অথবা 25B 77 অথবা 2N 610 একটি।
3. স্পীকার ঃ –4·85Ω একটি।
4. কনডেনসার ঃ—O·1μF এবং O·2μF—একটি করে।
5. রোধ ঃ—2KΩ, 11KΩ—একটি করে।
6. ব্যাটারি ঃ—1·5 ভোল্ট এর চারটি।

এবার Circuit Diagram অনুসারে মডেলটি তৈরি কর।

তোমাদের বাড়ির দরজার পাল্লা দুটোতে দুটো পেরেক মেরে নেবে। এবার ঐ দুই পেরেক একটি সরু তার দিয়ে আটকে নেবে যেন দরজা খুললেই তারটি ছিঁড়ে যায়। এবার ঐ তারের দুই প্রান্তে দুটি লম্বা তার আটকে নিয়ে লম্বা তারের অন্য দুই প্রান্ত (1) এবং (2) নম্বর চিহ্নিত তার দুটির সঙ্গে আটকে দেবে। (1) এবং (2) নম্বর চিহ্নিত তার দুটির সংযোগ ছিঁড়ে গেলে স্পীকার থেকে আওয়াজ বের হবে। তখনই তুমি জানতে পারবে যে অন্যায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বর্তনীটি আসলে একটি ফীড ব্যাক অডিও অসিলেটর। এখানে আউটপুট-এর (কালেকটার বর্তনীর) কিছু শক্তি ইন পুট-এ (বেস-এ) উপযুক্ত দশায় পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। এই বর্তনী থেকে যে কম্পন সৃষ্টি হয় তা শ্রুতি পারের শব্দ (1) এবং (2) নম্বর তার দিয়ে যুক্ত থাকলে ফীড ব্যাক কার্যকরী হতে পারে না। ফলে অসিলেটর থেকে শব্দ উৎপন্ন হয় না। তারটি যখনই খুলে যায় তখনই ফীড ব্যাক চালু হয়ে অসিলেটর থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়।

মডেলটি তৈরি করতে তোমরা ট্যাগ অথবা ভেরোবোর্ড ব্যবহার করতে পার। উপকরণগুলি ম্যাডান স্ট্রীটে এবং চাঁদনী চকে পাওয়া যাবে।

নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল, নবদ্বীপ, নদীয়া।

রকেটকূট / গৌতম ঘোষ

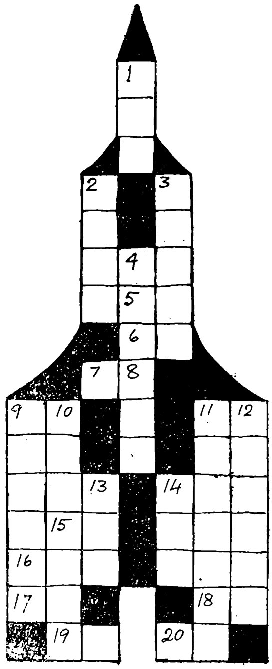

সূত্র ঃ—উপর নীচ ঃ—(1) 'কেতু' শব্দের অর্থ, (2) হ্যালির বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ হ্যালির সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার-কারী বিজ্ঞানী। (3) বিজ্ঞানের যে বিভাগ গ্রহ, তারা ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করছে। (4) মহাকাশ গবেষণায় দারুণ উন্নত একটি দেশ। (5) যে পথে ধূমকেতুর একবারই মাত্র দেখা মেলে। (6) '3' পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল + গণনা। (7) যে শতকের শেষ দিকে "হ্যালির ধূমকেতু" এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল। (8) মাত্র 26 বছর বয়সে যে ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি ধূমকেতুর গতিবিধি আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন। (13) জলে জন্মে। (14) ইংরাজী শব্দ, যার অর্থ ধূমকেতু।

সূত্র ঃ—পাশাপাশি ঃ—(4) বিগ ব্যাংগ সমাধানে যিনি প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। (5) (ভর × ত্বরণ)। (6) ক্ষুদ্র দানাযুক্ত খাদ্য বিশেষ। (7) ধূমকেতুর মস্তকের বাইরের গ্যাস গঠিত অংশ। (9) ভ্রমর। (14) গ্রাম বাংলার ফুল বিশেষ। (15) বর্জ্য পদার্থ। (16) সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ। (17) যাহাতে সকলের বিপুল ক্ষতি হয়। (18) শহর '—' তে আজকাল আর মুক্ত বায়ুর স্থান নেই। (19) আমেরিকার যে সংস্থা International Halley Watch গঠন করেছে। (20) যার ডাকে বর্ষা মুখরিত।

ক্যুইজ কনটেস্ট

January 1986

1. স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?
2. ডিমে কোন্ ভিটামিন থাকে না ?
3. পৃথিবীর বৃহত্তম যুগ্ম নদীর নাম কি ?
4. কটোপ্যাক্সি আগ্নেয়গিরি কোথায় অবস্থিত ?
5. স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় হ্রদটির নাম কি ?
6. রক্তে 120 গ্রামের বেশি গ্লুকোজ হলে তাকে কি বলে ?
7. জলের স্ফুটনাংক নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম কি ?
8. জৈব বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে বিজ্ঞানসম্মত পথ নির্ধারিত হয়েছে, তার নাম কি ?
9. 'রিকটার স্কেল' দিয়ে কি মাপা হয় ?
10. কোন্ দেশের জাতীয় বিমান পথের নাম AVIACO ?
11. বিশ্বে কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশি রূপা উৎপাদিত হয় ?
12. Almanac এবং Admiral শব্দ দু'টির উদ্ভব ঘটেছে কোন্ মূল ভাষা থেকে ?
13. 'ব্রজেন দাস' কি জন্য বিখ্যাত ?

ক্যুইজ কনটেস্ট, জানুয়ারী 1986-এর সমাধান মার্চ '86 সংখ্যায় থাকবে।

ডিসেম্বর '85 সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

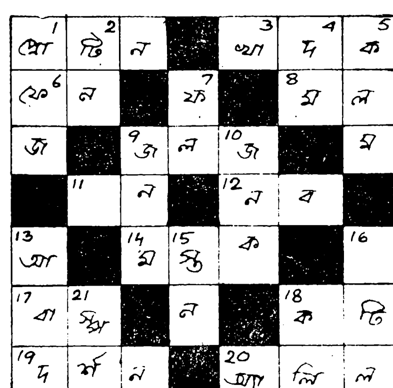

আই-কিউ টেস্ট
জানুয়ারী—1986

1. $4(x-1)=3x-3$ থেকে আমরা বলতে পারি

(a) x-এর একটি মান হবে এবং সেটি শূন্য

(b) x-এর একটি মান হবে এবং সেটি 1

(c) x-এর যেকোন মান হতে পারে

(d) x-এর কোন মানই পাওয়া যাবে না।

2. q জিনিস P টাকায় পাওয়া গেলে q টাকায় যত জিনিস পাওয়া যাবে, তা হলো

(a) $\frac{q^2}{P}$ (b) $\frac{P}{q}$ (c) $\frac{q}{P}$ (d) $\frac{P^2}{q}$

3. কোন গ্রুপটি বেমানান—

PQRS, IJKL, NMOP, EFGH, ABCD

4. কৃত্রিম তন্তু 'নাইলন' কোন শ্রেণীভুক্ত ?

(ক) পলিএস্টার, (খ) পলি অ্যামাইড,

(গ) পলি উরিথেন, (ঘ) পলিস্টাইরিন।

5. নিম্নোক্ত যোগগুলির মধ্যে কোনটি অ্যামিনো অ্যাসিড ?

(ক) ট্রিপ্টামিন, (খ) ট্রিপ্টোফ্যান,

(গ) ট্রিপ্টেসন, (ঘ) ট্রাইপামিটিন।

সমাধান মার্চ-86 সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১

ফোন নং—৪১-০০৬৯

প্রশ্নোত্তর

জানুয়ারী সংখ্যাটি বিশেষ ধূমকেতু সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই সংখ্যায় কেবলমাত্র ধূমকেতু বিষয়ক প্রশ্নগুলিরই উত্তর দেওয়া গেল। কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছো তোমরা এবং তোমাদের জ্ঞাতার্থে কিছু নতুন প্রশ্নও যুক্ত করা হলো। প্রশ্ন পাঠিয়েছো জয়কুমার দে, আনিসুল আলম, জয়শ্রী ধর, অনিন্দ্য দে, কাশ্মীর আলি খান, অনুপম আচার্য, সৌম্য পাণিগ্রাহী, রিণ্টু-মণ্টু ও নবারুণ।

প্রঃ। ধূমকেতু কি ও কাদের বলা হয় ?

উঃ ধূমকেতু মহাকাশের এক অতি অদ্ভুতদর্শন জ্যোতিষ্ক। গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই জ্যোতিষ্কদের কালেভদ্রে পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। ওদের নিজস্ব আলো নেই, সূর্য পরিক্রমা করে অথচ এক বা একাধিক বিরাট বিরাট পুচ্ছ থাকে (তবে পুচ্ছবিহীন ধূমকেতুও আছে।) ভর অত্যন্ত কম, তাই অভিকর্ষের টান অতি অল্প। এমন জ্যোতিষ্কদের ধূমকেতু বলা হয়।

ইংরেজী কমেট (Comet) শব্দটির অর্থ ধূমকেতু। কমেট শব্দটি এসেছে গ্রীক Kometes শব্দ থেকে—যার অর্থ কেশযুক্ত তারা।

প্রঃ ধূমকেতুর ক'টি অংশ এবং এগুলি কেমন ?

উঃ ধূমকেতুর চারটি অংশ। 1. মূলপিণ্ড বা মুণ্ড 2. পিণ্ডকে ঘিরে বহিরাবরণ বা কোমা 3. পুচ্ছ 4. কোমা ও পুচ্ছকে ঘিরে সূক্ষ্ম এক আবরণ।

মুণ্ড—মুণ্ড হচ্ছে ধূমকেতুর কেন্দ্রস্থল। একে খালি চোখে এমনকি দূরবীনেও দেখা যায় না। সব ধূমকেতুর মুণ্ডের ব্যাস সমান নয়। বিশ-ত্রিশ কিলোমিটার থেকে বিশ লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত বা আরো বেশি হতে পারে।

কোমা—মুণ্ডকে ঘিরে যে গ্যাসীয় আবরণটি আছে তাকেই বলা হয় কোমা। এর উপাদান প্রধানতঃ জলীয় বাষ্প, মিথেন ও অ্যামোনিয়া।

পুচ্ছ—ধূমকেতুর পুচ্ছ অতিশয় দীর্ঘ। আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত অনেক সময় বিস্তৃত হতে দেখা যায়। তবে ছোট পুচ্ছের ধূমকেতু যে দেখা যায় না এমন নয়।

ধূমকেতুরা যতই সূর্যের কাছাকাছি হয় ততই তাদের পুচ্ছের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে কিন্তু দূরে যেতে থাকলে পুচ্ছটি ক্রমশঃ ছোট হতে হতে এক সময় লুপ্ত হয়ে যায়। পুচ্ছের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মত হচ্ছে, ধূমকেতুরা সূর্য সন্নিধানে গমন করলে তার মুণ্ড ও মুণ্ডের বহি-রাবরণের ধূলিকণা এবং গ্যাসরাশি সূর্যরশ্মির চাপে আলগা হয়ে যায়। সেগুলি তখন তাপের প্রভাবে উত্তেজিত হয়ে নির্গত হয় পুচ্ছরূপে।

পুচ্ছটি বেশ উজ্জ্বল। অথচ এত পাতলা যে, তার ভেতর দিয়ে আকাশের তারাদের দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। গ্যাসকণা ও ধূলিকণা অতি বিরলভাবে অবস্থান করে এবং বিকিরণের ফলে ধূলি ও গ্যাস প্রতিপ্রভ প্রক্রিয়ায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই গ্যাস ও ধূলিকণা এত বিরল যে তার বিশাল পুচ্ছের বস্তুকণাকে একত্রিত করলে মাত্র কয়েক গ্রামের মতই হবে।

ধূমকেতুর মুণ্ড, কোমা ও পুচ্ছকে ঘিরে একটি বহি-রাবরণ থাকলেও সেটি সাধারণত দেখা যায় না। ইংরেজীতে ওকে বলে halo।

প্রঃ ধূমকেতুদের আকাশে কখন কিভাবে দেখা যায় ?

উঃ সাধারণতঃ ধূমকেতুকে সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে দেখা যায়। সূর্যের আলোতে অন্যান্য জ্যোতিষ্কের মত ধূমকেতুর অস্তিত্ব দিনের বেলায় ধরা পড়ে না।

প্রঃ ধূমকেতুর পুচ্ছ কেন নষ্ট হয়ে যায় এবং তার প্রমাণ কি ?

উঃ ধূমকেতু কয়েকবার সূর্য সন্নিধানে গমন করলে আপনা হতেই একদিন পুচ্ছ নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাকে ধূমকেতু বলে চেনাই যায় না। ব্যায়েলার ধূমকেতুকে পর্যবেক্ষণ করেই বিজ্ঞানীরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

বিজ্ঞানী ব্যায়েলার 1832 সালে ঐ ধূমকেতুকে সনাক্ত করেছিলেন। হিসেব করে তিনি বলেছিলেন, প্রতি $6\frac{3}{4}$ বছরে এটি সূর্য পরিক্রমা করে আসে। ব্যায়েলারের হিসাব মত ধূমকেতুটি 1839 সালে এবং 1845 সালে পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। পুনরায় 1845 সালে সে যখন আসে তখন তার পুচ্ছ ছিল না।

প্রঃ ধূমকেতুর শেষ পরিণতি কি ?

উঃ ধূমকেতুরা ঘন ঘন বা বেশ কিছু সংখ্যক বার সূর্যের কাছাকাছি এলে প্রথমে পুচ্ছটি খসে যায় ও পরে মুণ্ডটি অসংখ্য বস্তু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এবং তাদেরও তখন সূর্য-পরিক্রমা করতে হয়। ব্যায়েলার ধূমকেতুকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন, 1845 সালে যখন সে এসেছিল তখন তার পুচ্ছ ছিল না এবং আকার হয়েছিল মোচার মত। 1851 সালে ওর মাত্র একটি খণ্ড ফিরে এসেছিল। 1858 সালে এবং 1866 সালে

ওর আদৌ দেখা পাওয়া যায় নি। 1879 সালে এসেছিল প্রচুর উল্কা।

ব্যায়েলার ধূমকেতুটি উল্কায় পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর নভেম্বরের 27 তারিখ নাগাদ পৃথিবী ওদের কক্ষপথের কাছাকাছি হয়। তাই এই সময় পৃথিবীর বুকে প্রচুর উল্কা বর্ষণ হয়।

বর্তমানে কিছু কিছু বিজ্ঞানী আবার ধূমকেতুর শেষ পরিণতি উল্কা বলে স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা উল্কার সঙ্গে গ্রহাণুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

প্রঃ ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল?

উঃ ধূমকেতু সম্বন্ধে কতকগুলি কুসংস্কারই প্রচলিত ছিল। মনে করা হতো, আকাশে ধূমকেতু দেখা দিলেই ভূমিকম্প, বন্যা, রাষ্ট্রবিপ্লব ইত্যাদি ভয়ংকর কিছু হবে। উক্ত ধারণাগুলিকে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ অসার বলে প্রতিপন্ন করলেও এখনও এই বিজ্ঞানের যুগে সেই সংস্কার থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে নি।

প্রঃ ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদটি কি?

উঃ আবর্তনরত এক বিশাল আয়তনের গ্যাস ও ধূলিকণার পুঞ্জীভূত ঘন মেঘ থেকে একদিন জন্মলাভ করেছিল সূর্য। কিন্তু সবটুকু গ্যাস ও ধূলিকণা কাজে লাগাতে পারেনি। অথবা বলয় মতবাদ অনুযায়ী আদিতে সূর্য যখন ভয়ঙ্করভাবে আবর্তনরত ছিল তখন তার দুটি মেরু ভেতরের দিকে প্রবেশ করায় এবং মধ্যভাগ স্ফীত হয়ে ওঠায় এক সময় ধূলিকণা ও গ্যাসরাশি একটি বিরাট বলয়ের আকারে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ফলে সূর্যের আবর্তন বেগ মন্দীভূত হয় এবং বলয়টি—অথবা অবশিষ্ট গ্যাসীয় মেঘ সৌর-ঝড়ের দাপটে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। আর যতই দূরে সরে গেল ততই শীতল হতে থাকলো এবং ভারী বস্তুকণাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। কালক্রমে সেই বস্তুকণাগুলি একত্রিত হয়ে গঠন করলো এক একটি গ্রহ ও উপগ্রহ। কিন্তু হাইড্রোজেন প্রভৃতি এমন কিছু কিছু গ্যাস ছিল যারা অতি দূরে গিয়ে শীতল হওয়া সত্ত্বেও ঘনীভূত হতে পারেনি। এরা সূর্য থেকে এক কিংবা দুই আলোকবর্ষ দূরে শীতল পিণ্ডে পরিণত হলো। ঘনত্ব অত্যন্ত কম হওয়ায় এরা গ্রহের রূপ নিতে পারল না। পরিণত হলো ধূমকেতুতে।

প্রঃ উর্ট ক্লাউড (Oort Cloud) কি?

উঃ সৌর জগতের একেবারে শেষ প্রান্তে সূর্যের দেহ থেকে এককালে বিচ্ছিন্ন হালকা গ্যাসপুঞ্জ জমাট বেঁধে কোটি কোটি শীতল পিণ্ডে পরিণত হয়ে একটা আবরণের মত ঘিরে আছে। এই পিণ্ডগুলি কিন্তু স্থির নয়। এদেরও পরিক্রমা করতে হচ্ছে। সৌর জগতের শেষ প্রান্তে পিণ্ডগুলির দ্বারা গঠিত আবরণের নাম উর্ট ক্লাউড। তত্ত্বটির প্রবক্তা 'উর্ট' নামে এক জ্যোতির্বিদ। তাই তাঁরই নামানুসারে অনুরূপ নামকরণ।

প্রঃ ধূমকেতুর উপাদানগুলি কি কি?

উঃ আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঠিক করেছেন ধূমকেতুর দেহের প্রধান উপাদান কারবন মনঅক্সাইড, হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্প। তাছাড়া কিছু কিছু সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পার্থিব বস্তুকণাও আছে।

প্রঃ উর্ট ক্লাউড থেকে ধূমকেতুরা কেমন করে সৌরজগতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার পর তাদের অবস্থা কেমন হয়?

উঃ যেহেতু ধূমকেতুরা স্থির নয়, তাই কেউ কেউ মনে করেন, বাইরের নক্ষত্রের অভিকর্ষের প্রভাবে কখনও সখনও উর্ট ক্লাউডের আবরণ থেকে ধূমকেতুরা ছিটকে এসে সৌরজগতের মধ্যে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় কেউ বিরাট এক উপবৃত্তাকার পথে সূর্য-পরিক্রমা করে (হ্যালির ধূমকেতু), কেউ বা একবার মাত্র পরিভ্রমণ করে সেই উর্ট ক্লাউডে ফিরে যায় (দু-একটি ধূমকেতু একবার আসার পর আর আসেনি), আর কেউবা সূর্য ও গ্রহদের অভিকর্ষের আওতায় এসে ক্রমাগত পাক খায় এবং শেষে ধ্বংস হয়ে যায় (ব্যায়েলার ধূমকেতু)। কদাচিৎ কোন ধূমকেতু সূর্য ও গ্রহদের আকর্ষণের টানাপোড়েনে ছিটকে উর্ট ক্লাউড ভেদ করে বাইরেও বেরিয়ে যায়।

প্রঃ ধূমকেতুদের পরিক্রমা কাল কেমন?

উঃ ধূমকেতুদের পরিক্রমা কালকে দুভাগে ভাগ করা হয়। স্বল্প পরিক্রমা কাল ও দীর্ঘ পরিক্রমা কাল। সৌরজগতের প্রায় 60 শতাংশ ধূমকেতুর পরিক্রমা কাল অত্যন্ত দীর্ঘ। এদের কক্ষপথ অধিবৃত্তাকার। এরা ছুটে আসে কিন্তু কয়েকশ' বছরেও হদিস পাওয়া যায় না। বাদবাকি 40 শতাংশ ধূমকেতুর পরিক্রমা কাল স্বল্প। সাড়ে তিন বছরেরও কম সময়ে সূর্য পরিক্রমা করে এমন ধূমকেতুও আছে। আবার স্বল্প পরিক্রমা কাল যাদের তারা বৃহস্পতি ও শনির কক্ষপথের বাইরে যেতে পারে না। যেহেতু ওরা বড় গ্রহ এবং আকর্ষণ বলও বেশি তাই ওদের আওতায় অনেক ধূমকেতুই আটকে আছে। আর হ্যালির ধূমকেতু আছে নেপচুনের আওতায়।

প্রঃ ধূমকেতুদের দেহের ভর কেমন?

উঃ ধূমকেতুদের দেহের ভর এত কম যে, আমরা কল্পনাই করতে পারি না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, উর্ট ক্লাউডে অবস্থানকারী কোটি কোটি ধূমকেতুর সম্মিলিত ভর পৃথিবীর মোট ভরের দশভাগের একভাগ মাত্র।

প্রঃ হ্যালির ধূমকেতুর পরিক্রমা কাল কত?

উঃ 76 বছর।

প্রঃ হ্যালির ধূমকেতু প্রথম কবে এসেছিল ?

উঃ চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, এটি খ্রীস্টপূর্ব 240 অব্দে তাদের দৃষ্টিতে পড়েছিল। এর পূর্বের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ পর্যন্ত সে 29 বার এসেছে এবং মাত্র একবার ছাড়া বাকি কয়েকবারের খবর হস্তগত করেছেন বিজ্ঞানীরা। সর্বশেষ দেখা গেছে 1910 খ্রীস্টাব্দে।

প্রঃ হ্যালির ধূমকেতু কবে দেখা যাবে ?

উঃ 1948 খ্রীস্টাব্দে সূর্য থেকে সর্বাধিক দূরত্বে গিয়ে আবার সূর্যের দিকে ফিরতে শুরু করেছে। এই বছর অর্থাৎ 1985 সালের 27শে নভেম্বর কাছাকাছি হবে। ডিসেম্বরের শেষাশেষি ওকে বাইনোকুলারের সাহায্যে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে। খালি চোখে দেখা যাবে না। 1986 সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে পশ্চিম আকাশে অনুজ্জ্বল তারার মত খালি চোখে দেখা যাবে। তারপর সূর্যের খুব কাছাকাছি হবে বলে কয়েকদিন দেখা যাবে না। পুনরায় ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে সূর্যোদয়ের ঘণ্টা কয়েক আগে দেখা যাবে পূর্বাকাশে। অতঃপর মার্চ মাসেও দেখা যাবে। গণনা অনুযায়ী সে পৃথিবীর কাছাকাছি হবে এপ্রিলের 11 তারিখের দিকে। মনে হয় ঐ সময় তাকে সুন্দর দেখাবে। তারপর ক্রমশঃ অনুজ্জ্বল হয়ে দূরে সরে যেতে যেতে মে মাসের পর আর খালি চোখে দেখা যাবে না।

প্রঃ এবার হ্যালির ধূমকেতুকে কে আগে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কবে ?

উঃ মাউণ্ট প্যালোমারের মানমন্দিরে রক্ষিত শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে 1982 সালের 16ই অক্টোবর তারিখে ডেভিড জেউইট ও এডওয়ার্ড ড্যানিয়েলসেন নামে দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর একটু পূর্বদিকে দেখতে পেয়েছিলেন ধূমকেতুটিকে।

প্রঃ হ্যালির ধূমকেতু এবার কেমন দেখাবে ?

উঃ হ্যালির ধূমকেতুকে দেখতে এককালে অপরূপই ছিল। কিন্তু 1910 সালে যখন এসেছিল তখন কিছুটা যেন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। এবার আরও নিষ্প্রভ দেখাবে। কারণ তীব্রবেগে বার বার সূর্য সন্নিধানে আসতে থাকলে সৌরবাত্যার প্রভাবে পুচ্ছের উপাদানগুলিকে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। হ্যালির ধূমকেতু আগে এসেছিল কিনা জানা নেই. তথাপি 30 বারের বার এ বছর আবির্ভাব হচ্ছে। অতএব ম্লান হওয়ারই কথা।

প্রঃ সূর্য থেকে হ্যালির ধূমকেতুর দূরত্ব কেমন ?

উঃ যেহেতু এক উপবৃত্তাকার পথে হ্যালির ধূমকেতু পরিক্রমা করছে, তাই দূরত্ব তার সব সময় সমান থাকে না। যখন সূর্যের কাছাকাছি হয় তখন দূরত্ব হয় মাত্র 9 কোটি কিলোমিটার। এ সময় সে থাকে শুক্রের কক্ষপথের ভেতরে। আর যখন দূরে যায় তখন সর্বাধিক দূরত্ব হয় 530 কোটি কিলোমিটার। সৌরজগতের শেষ প্রান্তে বলা যায়।

প্রঃ ভেগা প্রকল্প কি ?

উঃ হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে 1984 সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত রাশিয়া 'ভেনাস হ্যালি' নামে এক কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দুটি অনুসন্ধানী মহাকাশযান ধূমকেতুটির দিকে প্রেরণ করে। এই কর্মসূচীই সংক্ষেপে ভেগা নামে পরিচিত।

প্রঃ সোভিয়েত রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোন দেশ অনুসন্ধানী মহাকাশযান প্রেরণ করেছে এবং তার কর্মসূচীর নাম কি ? উঃ সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া জাপানও একটি অনুসন্ধানী মহাকাশযান প্রেরণ করেছে। তাদের পরিকল্পনাটির নাম 'প্ল্যানেট-এ'।

সুধাংশু পাত্র

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

অক্টো-নভেম্বর সংখ্যার 'কুইজ কনটেস্ট'-এর ফলাফল প্রকাশিত হল। জানুয়ারী সংখ্যার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ 30শে জানুয়ারী। সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আগে আসার ভিত্তিতে দশজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এ মাসের উপহার ঃ

সিদ্ধার্থ ঘোষের ঃ স্যামলয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা

পরিচালক ঃ ছোটদের দপ্তর

অপারেশন হ্যালি ঃ খেলার নিয়ম

সিদ্ধার্থ ঘোষ

পঁচাত্তর বছর অন্তর যিনি দেখা দেন তাঁকে দেখার জন্য লোকে ত অস্থির হবেই। হ্যালির ধূমকেতু দু'বার দেখার সুযোগ ঘটে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু হ্যালির ধূমকেতু দেখার জন্য কতগুলো সুযোগও পাওয়া দরকার। যেমন পরিষ্কার আকাশ, ঠিক সময়ে ঠিক দিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজে বার করা ইত্যাদি। 'অপারেশন হ্যালি' খেলাটার মধ্যেও অনেকটা সেই রকম অনিশ্চিত ব্যাপার রয়েছে। দু'তিন বা চারজনে মিলেও তোমরা খেলা শুরু করতে পার। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা রঙের একটা ঘুঁটি নিয়ে নাও। কপালে পরা রঙিন টিপ্ কয়েকটা নিলেই ভাল হয়। খেলা শুরু হবে 1 নং লেখা ঘর থেকে। প্রত্যেকেই পালা ক'রে ছক্কা চালবে এবং যার প্রথম 1 পড়বে সেই শুরু করবে। মানে, 1 পড়লে তবেই 1 নম্বর ঘরে ঢুকতে পারবে। 1 নম্বর ঘরে ঢোকার পর, একে একে যার যেমন দান পড়বে— সেইভাবে এগিয়ে যাবে। তোমরা হয়ত ভাবছ, যে আগে 100 নম্বর ঘরে পৌঁছতে পারবে, তারই জিত। উঁহু, তা নয়। এই খেলার মজা হল, হ্যালির ধূমকেতুর চলাচলের পথের ওপর তারকা-চিহ্নিত ঘরগুলোয় যে সবচেয়ে বেশি বার বসতে পারবে সেই জিতবে। ধরো, চারজনে খেলছ। লাল ঘুঁটি সবার আগে পৌঁছে গেছে 100 নম্বর ঘরে। শেষ দান ফেলে কিন্তু ঠিক 100 নম্বর ঘরেই যাবার পথে সে দু'বার হ্যালির ধূমকেতুর দেখা পেয়েছে। মানে তারকা-চিহ্নিত ঘরে দু'বার বসেছে। বাকি তিনটি ঘুঁটির মধ্যে ইতিমধ্যে কেউ যদি তিন বা তারও বেশি বার তারকা চিহ্নিত ঘরে বসে থাকে, তাহলে কিন্তু লাল ঘুঁটি জিততে পারবে না। কাজেই 100 নম্বর ঘরে পৌঁছনো মাত্র খেলা শেষ হয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু যে আগে পৌঁছবে সে-ই যে জিতবে এমন কোন কথা নেই। খেলার শেষে হিসেবের সুবিধার জন্য যে-ই কেউ তারাওলা ঘরে বসবে অমনি একটা করে হ্যালি-ঘুঁটি তুলে নেবে। খেলার শেষে যার কাছে বেশি হ্যালির ঘুঁটি থাকবে তারই জিত। আরেকটা কথা—ছয় পড়লেও কিন্তু কেউ দ্বিতীয়-বার চালবার সুযোগ পাবে না।

খেলার ঘুঁটি ও ছক্কা ঃ লুডো খেলার ঘুঁটি বা ছক্কা নিয়েও খেলতে পার তোমরা কিম্বা একটা লাট্টু ছক্কা তৈরি ক'রে নিতে পার তোমাদের অলয়দা-র এই পরিকল্পনার মতো। অলয় ঘোষালই অপারেশন হ্যালির ছবি এঁকে দিয়েছেন।

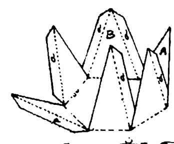

দাগে দাগে ভাঁজ করলে এরকম চেহারা দাঁড়ায়
ছবি-১ ক

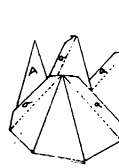

ছবি-2
তিনটে দিক জোড়ার পর কেমন লাট্টু তৈরী হচ্ছে দেখ।

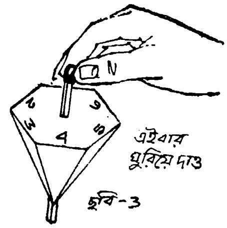

এইবার ঘুরিয়ে দাও
ছবি-3

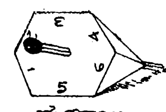

লাট্টু ঘুরে পড়ার পর...
দান পড়েছে-5।
ছবি-4

লাট্টু ছক্কা ঃ 'অপারেশন হ্যালি' খেলার বোর্ডের পাশ থেকে 1 নং ছবিটাকে প্রথমে বাইরের দাগ বরাবর কেটে নাও। এবার ডোরা-ডোরা দাগওলা লাইন বরাবর সেটাকে এমনভাবে ভাঁজ করো যাতে সেটা দেখতে হয় ছবি-ক' এর মতো। এবার 'B' ত্রিভুজ থেকে জোড়া শুরু করতে হবে। 'a' লেখা জায়গাগুলোতে আঠা লাগিয়ে নাও। জোড়া শুরু হওয়ার ছবি হল ছবি—2। সব শেষে জোড়া হবে 'A' ত্রিভুজ। 'B' ত্রিভুজের 'a'-লেখা চতুর্ভুজ এবং 'C' ত্রিভুজের 'a' লেখা চতুর্ভুজ দুটোর ওপর 'A' ত্রিভুজটা জুড়ে দিলেই লাট্টু-ছক্কা প্রায় রেডি। এবার ডোরা ডোরা রেখা দিয়ে তৈরি বড়ভুজটার মধ্যের বিন্দুটি ফুটো ক'রে দেশলাই কাঠি ঢুকিয়ে দাও। যেমন দেখা যাচ্ছে ছবি-3 এ। এখন লাট্টুটাকে দাঁড় করিয়ে পাক্ মেরে ছেড়ে দাও। ছবি—4 5 এ দ্যাখো দান পড়েছে 5।

ভাঙ্গা অংশগুলোতে ডেনড্রাইট সুপারজয়নার লাগান, একটু সবুর করুন, আর তারপরে একসঙ্গে চেপে ধরুন—ব্যাস!

জোড়া জিনিস মনে হবে যেন নতুন। চিনেমাটি, কাঠ, কাঁচ, সেরামিক, চামড়া... সে যাই হোক না, ডেনড্রাইট সহজেই জুড়ে দেয়, ভাঙ্গা যে ছিল তা আর মনেই থাকেনা।

ডেনড্রাইট *জুড়তে যার জুড়ি নেই*

সুপার জয়নার

চন্দ্রস্ কেমিক্যাল এন্টারপ্রাইজেস্ (প্রাঃ) লিঃ
পি-৩৫ সি.আই.টি. রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৪

ডেনড্রাইট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাডেসিভ্ রেঞ্জে পাবেন : ডেনড্রাইট পি.সি.-৬৫, পি.সি.-১৮২, ও.আর.-১০০, এস.আর.-১৯, এস.আর.-৬০, এস.আর.-১২০ এবং হট্‌মেল্ট এ্যাডেসিভ্।

CC-1 BEN

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 6 th Yr Vol – 8 · JAN – 1986/Regd.No. WBEC/25

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ ১০

অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ ১০

অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ ১০

অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ ১০

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ১০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৬, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রা: লি: কলকাতা ১২

মূল্য—৪